572/2
BAB-1974

বার্ষিক রিপোর্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক

১৯৭৩-৭৪

বাংলাদেশ ব্যাংক

BAB-1744

১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত
সময়ের কার্য-বিবরণী ও হিসাব সমূহ।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গভর্ণর

এ, এন, হামিদুল্লাহ

সহকারী গভর্ণর

কে, এ, রশীদ

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

এ, এম, এ, রাহিম

কার্যকরী পরিচালকবৃন্দ

এ, কে, গঙ্গোপাধ্যায়

এ, এম, আমিনুল হক চৌধুরী

এম, খালিদ খান

হিসাব রক্ষণ বিভাগ

এল, কিউ, চৌধুরী — পরিচালক

কৃষি ঋণ বিভাগ

এস, এ, কবির — প্রধান অফিসার

ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

এ, টি, এম, আমিন — প্রধান অফিসার

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

এ, আর, চৌধুরী — পরিচালক

গবেষণা বিভাগ

কাজী বদরুল আলম — পরিচালক

সংস্থাপন বিভাগ

এম, এ, হক — পরিচালক

বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

এম, ইজাদুর রহমান — নিয়ন্ত্রক

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ

এ, ও, এম, শামসুদ্দোহা — পরিচালক

জন-সংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ

শাহাবুদ্দীন আহমেদ — পরিচালক

সচিবের বিভাগ

এ, আর, চৌধুরী — সচিব

পরিসংখ্যান বিভাগ

নাজিমুদ্দীন খাজা — পরিচালক

ব্যাংকের অফিসসমূহ

ঢাকা	এম, এ, খান	ম্যানেজার
চট্টগ্রাম	বি, এম, আহমদ	ম্যানেজার
খুলনা	এস, বি, কে, চৌধুরী	ম্যানেজার
বগুড়া	এস, এম, এ, এইচ, আনসারী	ম্যানেজার
রাজশাহী	নিজামুদ্দীন আহমদ	সহকারী নিয়ন্ত্রক
সিলেট	এ, টি, আহমদ চৌধুরী	সহকারী নিয়ন্ত্রক

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সাধারণ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা	১
খাদ্য পরিস্থিতি	৩
পণ্যের বাজার	৩
(ক) পাট	
(খ) চা	
(গ) পশুচর্ম ও চামড়া	
শিল্পোৎপাদন	৫
দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি ও জীবনধারণের ব্যয়	৬
অর্থ সরবরাহ	৭
ব্যাংক ও ঋণ পরিস্থিতি	৮
ব্যাংকের হার	৯
সুদের হার	৯
তলবী অর্থ বাজার	১০
ঋণ - [illegible] পদক্ষেপ	১১
ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন	১১
পুনর্বাসনমূলক ঋণ দান	১৩
ব্যাংক পরিদর্শন	১৩
পাট শিল্পে অর্থযোগান	১৩
চা শিল্পে অর্থযোগান	১৪
কৃষি ঋণ কার্যক্রম	১৪
রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট	১৬
সরকারের ঋণ	১৯
মূল্য পরিশোধ পরিস্থিতি	২১
আমদানী ও রপ্তানী নীতি	২২
বাণিজ্য ও পরিশোধ চুক্তি	২৪
বিনিময় হার	২৫

	পৃষ্ঠা
বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ	২৬
বৈদেশিক সাহায্য	২৭
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	২৮
চাকরির শর্তাবলী উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কাজ	২৮
কার্যালয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা	২৯
ব্যাংক ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	২৯
ব্যাংক নোট	২৯
মুদ্রা	৩০
ইস্যু বিভাগ	৩০
ব্যাংকিং বিভাগ	৩১
বার্ষিক হিসাব	৩১
নিরীক্ষক নিয়োগ	৩২
সর্বশেষ	৩২

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ৪০ নং ধারার ২ নং উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুত ১৯৭৪ সালের জুন মাসে সমাপ্ত অর্থ বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব-বিবরণী।

সাধারণ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

বাংলাদেশের অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধকালীন বিপুল পরিমাণের ক্ষয়ক্ষতি ও স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে উপর্যুপরি শস্য লাভের ব্যর্থতা কাটিয়ে, ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছরে কিছুটা আরোগ্য লাভ করে। ১৯৭৩-৭৪ সালে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উৎপাদন, স্বাধীনতা-লগ্নকালীন সময়ের উৎপাদনের থেকে অনেকখানি বেড়ে গেলেও তা ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন সীমায় পৌঁছাতে অসমর্থ হয়। প্রস্তাবিত শতকরা ১৭ ভাগ অগ্রগতির জায়গায় অপরিবর্তিত উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে, বিবরণীর বছরে, বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন, ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় প্রকৃত অর্থে বৃদ্ধি পায় শতকরা ১২ ভাগ। কৃষিখাতে চাল উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৮ ভাগ। অন্যান্য ফসল উৎপাদনে বৃদ্ধির হার অনুল্লেখ্য। ফলে, ১৯৭৩-৭৪ সালে শস্য উৎপাদন সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৫ ভাগ। বিবরণীর বছরে উৎপাদিত আউশ ফসলের পরিমাণ ছিল ২৮·০২ লক্ষ টন, অর্থাৎ, লক্ষ্যমাত্রা ২৭·৯৭ লক্ষ টনের কিছুটা উপরে। আমন ও বোরো ফসল উৎপাদিত হয় লক্ষ্যমাত্রার নীচে। ১৯৭৩-৭৪ সালে লক্ষ্যমাত্রা ৭২·৫৭ লক্ষ টনের জায়গায় আমন ফসল উৎপাদিত হয় প্রকৃতপক্ষে ৬৭ লক্ষ টন। ২৪·৪১ লক্ষ টন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বোরো ফসল উৎপন্ন হয় ২২·২০ লক্ষ টন। ১৯৭৩-৭৪ সালে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় চাল উৎপাদন কমে যায় মূলতঃ অসময়োচিত বন্যার ফলশ্রুতি হিসাবে। তথাপি, ১৯৭৩-৭৪ সালে চালের গড় উৎপাদন দাঁড়ায় ১১৭·২২ লক্ষ টন। ১৯৭২-৭৩ সালের ৯৯·৩০ লক্ষ টনের তুলনায় উপরোক্ত উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৩-৭৪ সালে কাঁচা পাট (মেশতাসহ) উৎপাদিত হয় বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ৬১·৫০ লক্ষ বেলের সমান। উৎপাদনের এই পরিমাণ যদিও পূর্ববর্তী বছরের ৬৬·২৪ লক্ষ বেলের তুলনায় অনেক কম। ১৯৭২-৭৩ সালের ৫২·৮০ মিলিয়ন পাউণ্ডের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে চা উৎপাদিত হয়েছে ৬০·৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড।

শিল্পক্ষেত্রে, অন্ততঃপক্ষে, স্বাধীনতা-পূর্ব ১৯৬৯-৭০ সালের স্বাভাবিক উৎপাদন সীমায় পৌঁছাবার জন্য, ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার নির্ধারিত হয়েছিল শতকরা ৩০ ভাগে। বাস্তবিকপক্ষে, ১৯৭৩-৭৪ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। ১৯৭৩-৭৪ সালে পাটজাত দ্রব্য

উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালের ৪'৪৬ লক্ষ টন থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ টনে। ১৯৭২-৭৩ সালের ৮০৮'৯৫ লক্ষ পাউণ্ডের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে সূতা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৩'৪৭ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের ৫৮৪'৩৫ লক্ষ গজের তুলনায় সূতী বস্ত্র উৎপাদন বেশ কিছুটা বেড়ে গিয়ে ৭৯৩'৭৮ লক্ষ গজে দাঁড়ায়। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে চিনি ও সিমেন্ট উৎপাদন উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৩-৭৪ সালে জাতীয় উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও আমাদের অর্থনীতির উপর মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপ অপ্রশমিত থেকে যায়। পরিকল্পনা কমিশনের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় এ বছর গড় মূল্য-মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। এই মারাত্মক মূল্য-বৃদ্ধির অন্যতম মৌল কারণ হচ্ছে আমদানীকৃত ভোগ্যপণ্য, শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির আকাশচুম্বী ক্রয়মূল্য যার ফলে আবার শিল্পোৎপাদন ব্যয় বেশ কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে অর্থ সরবরাহের প্রসারণ। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে সমাপ্ত বছরে অর্থ সরবরাহ বেড়েছে শতকরা ১৭ ভাগ। দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির হার জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, সরকার কর্তৃক বিপুল পরিমাণে ঘাটতি অর্থযোগান ও বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণের প্রসারণের ফলে জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় অর্থ সরবরাহ বেড়ে যায় সামঞ্জস্যহীনভাবে। জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় অর্থ সরবরাহ অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায়, স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় মূল্য -বৃদ্ধির হার একটু বেশি বেড়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, গত বছরের মুদ্রাস্ফীতিজনিত কুফল অব্যাহত থেকে গেছে। শ্রমিকদের উচ্চহারে বেতনদান ও ত্রুটিপূর্ণ সরবরাহ-ব্যবস্থাও মূল্যমাত্রাকে বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। ১৯৭২-৭৩ সালের ২১০'৩৩ কোটি টাকার (৬৫'৯৮ কোটি টাকা পাকিস্তানী নোট পরিশোধসহ) তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে অর্থ সরবরাহ ১২০'৭৫ কোটি টাকা বেড়ে মোট ৮১৬'৭৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। রাজস্ব সম্বন্ধীয় সরকারী কার্যক্রমে ঘাটতি ও সরকারী এবং বেসরকারী এই উভয় খাতে বিপুল পরিমাণের ঋণ সম্প্রসারণের ফলে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। যেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮৫'৯৪ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে ২০৪'৩৮ কোটি টাকার মত বেড়ে তা ৮১৬'৯৩ কোটিতে ঠেকে। ১৯৭২-৭৩ সালের ১৭৯'০৭ কোটি টাকা বৃদ্ধির তুলনায় তপশিলী ব্যাংকসমূহের সাধারণ আমানত ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৮২'৭১ কোটি টাকার মত বেড়ে ৮৮৫'৩৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। যেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে তপশিলী ব্যাংকগুলি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে ৭'৭৪ কোটি টাকা ঋণ করে সেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে অনুরূপ ঋণের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৭'৮৯ কোটি টাকা।

পূর্ববর্তী বছরের ১২'৪ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে পরিশোধ-ক্ষমতায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় ৬৩'৮ কোটি টাকা। পরিশোধ-ক্ষমতায় এই অবনতি ঘটার কারণ হচ্ছে পণ্যদ্রব্য ও অন্যান্য

ক্রয় বাবদ ২৫০'৮ কোটি টাকার ঘাটতি। অবশ্য, এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি পুঁজি লেনদেন খাতে ১৯২'১ কোটি টাকা অর্জন ও পরিশোধনীয় নয় (unrequited transfers) এমন ৭'৩ কোটি টাকা প্রাপ্তির ফলে অনেকখানি প্রশমিত হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের রপ্তানী আয় ৩৩'৩ কোটি টাকার মত কমে গিয়ে ২৫২'৩০ কোটি টাকায় ঠেকে। অপর দিকে, অনুরূপ সময়ের মধ্যে আমদানী-ব্যয় ১৭৯'১ কোটি টাকা পরিমাণবেড়ে ৬৬৭'৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

খাদ্য পরিস্থিতি

১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে অবনতি ঘটে। ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় এবছর চাল উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও এই অবনতি অব্যাহত থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালের ৯৯'৩০ লক্ষ টনের জায়গায় ১৯৭৩-৭৪ সালে চাল উৎপাদিত হয় ১১৭'২২ লক্ষ টন। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১৯৭৪ পঞ্জিকা বছরে ১৭'৮০ লক্ষ টনের মত খাদ্য ঘাটতি হবে। ১৯৭৪ সালের জন্য খাদ্য শস্যের আমদানী চাহিদা হিসাব করা হয়েছে ২২'৪২ লক্ষ টন। এই হিসাবের মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত সংরক্ষণের জন্য ২'৬২ লক্ষ টন ও সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ২'০০ লক্ষ টন গমের বদলীকরণ। ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে আমদানীকৃত মোট খাদ্য শস্যের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৬'৭৯ লক্ষ টন, চাল ৮৫,৬৯৩ টন ও গম ১৫,৯৩ ৬৩৫ টন। বিপুল পরিমাণ খাদ্য-শস্য আমদানী ও ভাল ফলন হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে চোরা কারবার ও মজুতদারী। ১৯৭৩ সালের জুন শেষে মোটা চালের মণ প্রতি নিম্নতম খুচরা মূল্য ছিল ৮৫'৩০ টাকা। ১৯৭৪ সালের অনুরূপ সময়ে এই দাম বেড়ে গিয়ে ১৩০'৪২ টাকা হয়। এক বছরে এই মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৫৩ ভাগ। অনুরূপভাবে, যেখানে ১৯৭৩ সালের জুন শেষে মাঝারি চালের গড়পড়তা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল মণ প্রতি ১০১'১৪ টাকা, সেখানে ১৯৭৪ সালের অনুরূপ সময়ে তা বেড়ে গিয়ে ১৫০'৪০ টাকা হয়। গত বছরের তুলনায় এই মূল্য-বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৪৯ ভাগ।

পণ্যের বাজার

১৯৭৩-৭৪ সালে পণ্যের বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এই সময়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায়। ১৯৭৩-৭৪ মওসুমে চায়ের মূল্য গুণ-ভেদে স্বল্প পরিসরের মধ্যে উঠা নামা করে। বিবরণীর বছরে পশুচর্ম ও চামড়ার মূল্য কমতে দেখা যায়।

(ক) পাট

কাঁচা পাট (মেশতাসহ) উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৩-৭৪ সালে ছিল ৬৬'২৪ লক্ষ বেল। ১৯৭৪ সালে উৎপাদন হয় ৬১'৫০ লক্ষ বেল। চাল অপেক্ষা পাট বাজারে কম দাম পেতে থাকে বলে

পাট চাষ কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর পুনরায় কাজ করতে থাকায় পাট রপ্তানী ও দেশের অভ্যন্তরে পাট বিক্রয়ের অসুবিধা দূরীভূত হয়। এ বছর বাংলাদেশ জাহাজ সংস্থা বন্ধু দেশগুলো থেকে কয়েকটি সমুদ্রগামী জাহাজ লাভ করে। ফলে, পাট ও পাটজাত দ্রব্যের জাহাজ-পরিবহণ বৃদ্ধি পায়।

গত মওসুমের ৬৩'২৯ লক্ষ বেলের তুলনায়, ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের বিভিন্ন হাট-বাজারে কাঁচাপাট বেচা-কেনা হয় মাত্র ৫৫'১৬ লক্ষ বেল। যেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে ১২'৬২ লক্ষ বেল পাট গুদামজাত করা হয়েছিল, সেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে অবশ্য, এই গুদামজাতকরণের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ২২'১১ লক্ষ বেল হয়।

১৯৭২-৭৩ মওসুমে কাঁচা পাট ও মেশতার রপ্তানী-বিক্রয়ের পরিমাণ ২৬'৬২ লক্ষ বেল ছিল। ১৯৭৩-৭৪ মওসুমে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩'১৯ লক্ষ বেল। ১৯৭২-৭৩ সালের ২৮'২৬ লক্ষ বেলের তুলনায়, ১৯৭৩-৭৪ মওসুমে কাঁচা পাট (মেশতাসহ) রপ্তানীকরণের প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২৬'৬২ লক্ষ বেল।

(খ) চা

১৯৭৩-৭৪ চা মওসুমে * চা উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০'৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড। তুলনামূলকভাবে, ১৯৭২-৭৩ মওসুমে চা উৎপাদিত হয়েছিল ৫২'৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড। দেখা যাচ্ছে, এই মওসুমে চা শিল্প মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে।

১৯৭৩-৭৪ চা মওসুমে চা-এর প্রথম আভ্যন্তরীণ নিলাম বিক্রি সম্পন্ন হয় ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে। সেই বাজারে চায়ের দাম পাউণ্ড প্রতি সর্বনিম্ন '৮০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩'২০ টাকার মধ্যে ছিল। প্লেইন বি ও পি চা-এর মূল্য ছিল পাউণ্ড প্রতি ২ টাকা থেকে ২'৬০ টাকা। প্লেইন ফ্যানিংস চায়ের মূল্য ছিল '৮০ টাকা থেকে ১'১০ টাকা এবং সি টি সি-ও এফ চায়ের পাউণ্ড প্রতি মূল্য ছিল ২'২০ টাকা থেকে ৩'২০ টাকার মধ্যে। প্রথম বিক্রিতে সি টি সি, বিও পিও ওএফ শ্রেণীর চায়ের চাহিদা খুবই বেড়ে যায়—বর্ধিত মূল্যেও। মওসুমের সর্বশেষ নিলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয় ১৯৭৪ সালের ২০শে মার্চ তারিখে। এই নিলামে সকল প্রকার চায়ের ক্রয়-চাহিদা বাড়ন্ত দেখা যায়। কিছুটা বর্ধিত মূল্যে খাঁটি ফ্যানিংস চা-এর চাহিদা দেশ ও বিদেশে বেড়েছে মনে হয়। মাঝারি জাতের ফ্যানিংস চা-এর চাহিদা বাড়তে দেখা যায়। সি টি সি ও লেগ-কাটস চা-ও অধিকতর মূল্যে বিক্রি হয়।

মওসুমের সর্বশেষ বিক্রয়ে বি ও পি শ্রেণীভুক্ত সকল চা-এর মধ্যে পরিষ্কার কালো বি ও পি চা বিক্রি হয় সর্বোচ্চ মূল্যে—পাউণ্ড প্রতি ৩'৪৫ টাকা থেকে ৪'০০ টাকা পর্যন্ত। এই মওসুমে সব রকমের

* ১৯৭৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৪ সালের মার্চ পর্যন্ত।

চা-এর মধ্যে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয় সি টি সি-ফ্যানিংস চা ও সর্বশেষ বিক্রিতে এর চূড়ান্ত দাম হয় পাউণ্ড প্রতি ৪'৭০ টাকা থেকে ৫'০০ টাকা।

গত চা-মওসুমে চা রপ্তানী করা হয়েছিল মোট ৪১'৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৯৭৩-৭৪ মওসুমে * রপ্তানীর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ৫০'৭৭ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ১৯৭৩-৭৪ মওসুমে * চা থেকে মোট বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ হচ্ছে ১০'০৫ কোটি টাকার সমান। গত বছর এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৬'২০ কোটি টাকার সমান।

(গ) পশুচর্ম ও চামড়া

১৯৭৩-৭৪ সালে পশুচর্ম ও চামড়ার দাম বেশ কিছুটা উঠা-নামা করতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ২রা জুলাই এ প্রতি একশোটি লবণাক্ত ভারী ভেজা গাভীর চামড়ার দাম উদ্ধৃত হয় ৪,০০০ টাকা। ১৯৭৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর এর দাম বেড়ে গিয়ে ৪,৬০০ টাকা হয়। ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আবার এর দাম কমে গিয়ে ৩,০০০ টাকা হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ৩০শে মার্চ দাম আবার বেড়ে যায় এবং ৩,৪০০ টাকা হয়। যথাক্রমে ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ও ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে পশু চর্ম ও চামড়ার নিম্নতম ও সর্বোচ্চ মূল্য উদ্ধৃত হয়। যেখানে, ১৯৭৩ সালের ২রা জুলাই প্রতি একশোটি ছাগলের চামড়ার মূল্য হয় ১৬০০ থেকে ২২০০ টাকা, সেখানে ১৯৭৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর এর দাম পাওয়া যায় ২১০০ থেকে ২৬০০ টাকা। তারপর, ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই দাম কমে গিয়ে ১৮০০ থেকে ২২০০ টাকার মধ্যে হয়। ১৯৭৪ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে এর দাম বেড়ে গিয়ে ২৩০০ টাকা থেকে ২৮০০ টাকা হয়; কিন্তু ঐ দাম ১৯৭৪ সালের ২২শে জুনে কমে গিয়ে ১৮০০ থেকে ২৪০০ টাকায় গিয়ে ঠেকে। প্রতি একশোটি ভেড়ার চামড়া ১৯৭৩ সালের ২রা জুলাই-এ ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত দাম পায়, কিন্তু ১৯৭৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর এর দাম হয় ৮০০ থেকে ৮৫০ টাকা পর্যন্ত। ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দাম থাকে। পরে, ১৯৭৪ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে প্রতি একশোটি ভেড়ার চামড়ার দাম আবার বেড়ে গিয়ে ৯০০ থেকে ৯৫০ টাকা হয় এবং ১৯৭৪ সালের জুন পর্যন্ত এই দাম থাকে।

শিল্পোৎপাদন

গত বছরের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে শিল্পোৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। গত বছরের ৪'৪৬ লক্ষ টনের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫'০০ লক্ষ টন। ১৯৭২-৭৩ সালে সূতা ও সূতীবস্ত্র উৎপাদিত হয়েছিল যথাক্রমে ৮০৮'৯৫ লক্ষ পাউণ্ড ও ৫৮৪'৩৫

---

* ১৯৭৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৪ সালের মার্চ পর্যন্ত।

কারণ সমূহ :

(ক) সমন্বয়িত আভ্যন্তরীণ ঋণ সম্প্রসারণ/সংকোচন		+৫১·২৬
১। বেসরকারী খাত	+৫২·৬৮	
২। সরকারী খাত	+১০৫·২৫	
৩। তপশিলী ব্যাংকসমূহের (আন্তঃব্যাংক হিসাব বাদে) দীর্ঘ মেয়াদী আমানত	−১০৬·৬৭	
খ) রাজস্ব সম্বন্ধীয় সরকারী কার্যক্রম		+১৭২·৩৪
(গ) বৈদেশিক খাত		−৮৩·১৭
(ঘ) অবশিষ্টাংশ		−১৯·৬৮
মোট কারণসমূহ		+১২০·৭৫

অর্থ সরবরাহের পর্যায়-ক্রমিক বিবরণ ও অংশসমূহ নীচে দেয়া হোল :—

(কোটি টাকার হিসাব)

সময়	বাজারের চালু মুদ্রা	তলবী আমানত	অর্থ সরবরাহ
জুন মাসে সমাপ্ত ১৯৭৩ সালে	২৮৬·৪৩	৪০৯·৬০	৬৯৬·০৩
ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত ১৯৭৩ সালে	৩২০·৭৯	৪৮৭·১৫	৮০৭·৯৪
জুন মাসে সমাপ্ত ১৯৭৪ সালে	৩৩১·১৪	৪৮৫·৬৪	৮১৬·৭৮

ব্যাংক ও ঋণ পরিস্থিতি

১৯৭২-৭৩ সালের ১৮৫·৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধির তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছরে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২০৪·৩৮ কোটি টাকা বেড়ে ৮১৬·৯৩ কোটি টাকায় পৌঁছে। ব্যাংক ঋণের মধ্যে আগাম ঋণের পরিমাণ ১৬০·৭১ কোটি টাকা বেড়ে ৭১৪·৯৬ কোটি টাকা হয় এবং 'ক্রীত ও বাটাকৃত বিলের' পরিমাণ ৪৩·৬৭ কোটি টাকা বেড়ে ১০১·৯৭ কোটি টাকা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত, বিশেষ করে, পাট-ব্যবসায়, পাটকল ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ গ্রহণ করার ফলেই ব্যাংক-ঋণের

পরিমাণ বেড়ে যায়।

১৯৭৩ সালের পহেলা জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে তপশিলী ব্যাংকগুলির আমানত (আন্তঃব্যাংক হিসাব বাদে) ১৮২'৭১ কোটি টাকা বেড়ে ৮৮৫'৩৯ কোটি টাকা হয়। পক্ষান্তরে, ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে তপশিলী ব্যাংকগুলোর আমানত বেড়েছিল ১৭৯'০৭ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকের সবগুলি আমানতের মধ্যে তলবী আমানত ৭৬'০৪ কোটি টাকা বেড়ে ৪৮৫'৬৪ কোটি টাকা হয় এবং দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত ১০৬'৬৭ কোটি টাকা বেড়ে ৩৯৯'৭৫ কোটি টাকা হয়। এই বিপুলাকার ব্যাংক আমানত বৃদ্ধির প্রধান কারণ এই যে, দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা ফিরে আসে।

বিবরণীর বছরে ব্যাংকের দেনা পরিশোধের ক্ষমতা কিছুটা খারাপ ছিল। আমানত সম্পদের ১৮২'৭১ কোটি টাকা বৃদ্ধির বিপরীতে ১৯৭৩-৭৪ সালে ব্যাংক ঋণ বেড়ে যায় ২০৪'৩৮ কোটি টাকা। যার ফলে তপশিলী ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অধিক পরিমাণ টাকা ধার করতে হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ৪৭'৮৯ কোটি টাকা বেড়ে ৯৪'৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংরক্ষিত টাকার পরিমাণ মাত্র ০'৮৩ কোটি টাকা বেড়ে ৬৬'৬৭ কোটিতে দাঁড়ায়। আর বিবরণীর বছরে তাদের কাছে নগদ অর্থের পরিমাণ ২'১৮ কোটি টাকা বেড়ে ২১'১৪ কোটিতে দাঁড়ায়।

ব্যাংকের হার

১৯৭৪ সালের ২১শে জুন তারিখ থেকে ব্যাংকের প্রচলিত হার শতকরা ৫ ভাগ থেকে শতকরা ৮ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে।

সুদের হার *

বিবরণীর বছরে আমানত ও আগামের উপর সুদের হার অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৭৩-৭৪ সালে সুদের হার নিম্নরূপ ছিল:

বিভিন্ন প্রকার আমানত	সুদের হার
(১ ক) বিশেষ নোটিশযুক্ত হিসাব অথবা ৭-২৯ দিনের নোটিশে টাকা তোলা যায় এমন হিসাব	৩% প্রতি বছর
খ) বিশেষ নোটিশযুক্ত হিসাব অথবা ৩০ অথবা এর বেশী দিনের নোটিশে টাকা তোলা যায় এমন হিসাব	৩$\frac{1}{8}$% "
(২ ক) চেক্ ব্যবহারের সুযোগসহ সঞ্চয়ী হিসাব	৪% "

* ১৯৭৪ সালের ২১শে জুন তারিখের বর্ধিত ব্যাংক হারের প্রেক্ষিতে সুদের হারের যে পরিবর্তন সূচীত হয় সেগুলি কার্যকর হয় ১৯৭৪ সালের ১লা জুলাই থেকে।

খ) চেক্ ব্যবহারের সুযোগবিহীন সঞ্চয়ী হিসাব অর্থাৎ যে হিসাবে পাসবই দেখিয়ে ও স্লিপ ব্যবহারে টাকা তোলা যায়	$4\frac{1}{2}\%$	„
৩। মেয়াদী আমানত		
(ক) ৩ মাস অথবা ৩ মাসের উপরে কিন্তু ৬ মাসের কম সময়ের জন্য	$4\frac{1}{2}\%$	„
(খ) ৬ মাস অথবা ৬ মাসের উপরে কিন্তু ১ বছরের কম সময়ের জন্য	$4\frac{3}{4}\%$	„
(গ) এক বছর অথবা এক বছরের উপরে কিন্তু দুই বছরের কম সময়ের জন্য	৫%	„
(ঘ) দুই বছর অথবা দুই বছরের উপরে কিন্তু তিন বছরের কম সময়ের জন্য	$5\frac{1}{2}\%$	„
(ঙ) তিন বছর অথবা তিন বছরের বেশী সময়ের জন্য	৬%	„

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক উপরে বর্ণিত সুদের হারের চেয়ে শতকরা ১ ভাগ বেশী সুদ নিতে পারে।

স্বাধীনতার পূর্বে যেমন ছিল, স্বাধীনতার পরেও ছোট ব্যাংকগুলো তাদের আগাম-ঋণের উপর সাধারণ খাতকের কাছ থেকে শতকরা ১০ ভাগ আদায় করছে। আর বড় ব্যাংকগুলো আদায় করছে শতকরা ৯ ভাগ সুদ। পাট ব্যবসায় ও পাট শিল্পের দ্রুত পুনর্বাসনকল্পে পাটের প্রতি আগামের উপর শতকরা $7\frac{1}{2}$ ভাগের উপর সুদ ধরা হচ্ছে না।

তবলী অর্থ বাজার

দেশের উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার জন্য ঢাকায় একটি তবলী অর্থ বাজার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক বিবরণীর বছরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় তা উল্লেখযোগ্যভাবে সফলতা লাভ করেনি। দেশের বিভিন্ন অর্থ প্রতিষ্ঠান এবং বড় বড় সংস্থাগুলির কাছে অর্থের উদ্বৃত্ত তহবিল না থাকায় তলবী বাজারের তৎপরতা প্রধানতঃ ব্যাংকগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তলবী বাজারকে কার্যকর করবার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয় এবং সরকার ১৯৭৪ সালের ২১শে জুন তারিখে ব্যাংকের হার শতকরা ৫ ভাগ থেকে ৮ ভাগে উন্নীত ক'রে অধুনা যে "অর্থ মহার্ঘ" নীতি অবলম্বন করেন তার ফলে তলবী অর্থবাজার গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, আমানত ও ঋণের উপর ধার্য সুদের হার যুক্তিসঙ্গত করে তোলার ফলে অদূর ভবিষ্যতে একটি আন্তঃব্যাংক তলবী অর্থবাজার গড়ে উঠবে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ

গত বছর যে সব ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা বেশ ফলপ্রসূ হয়। তাই চলতি অর্থ বছরে নূতন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ১৯৭৩-৭৪ সালে যে সব ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

(ক) বিবরণীর বছরে তপশিলী ব্যাংকগুলোর মোট তলবী এবং দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আবশ্যিকভাবে শতকরা ৫ টাকা জমা রাখার যে নিয়ম ছিল তা বলবৎ থাকে।

(খ) তপশিলী ব্যাংকসমূহের দেনা পরিশোধের আনুপাতিক হার আগেরমত মোট তলবী ও দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের শতকরা ২৫ ভাগে নির্ধারিত থাকে।

(গ) বিবরণীর বছরে, ১৯৭২-৭৩ সালের মতই বিভিন্ন বাছাইমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি বলবৎ থাকে। কেবল মাত্র উৎপাদনে উসহায়ক কাজগুলির বেলায় ১২ মাসের উপরে নয় এমন সময়ের জন্য কোন পার্টিকে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত গ্যারান্টিযুক্ত আগাম অথবা অন্য আগাম দেওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই সুবিধা দেওয়া হয় ১৯৭৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে।

ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বিপর্যস্ত ব্যাংক ব্যবস্থাকে পুনর্বাসিত করার জন্য যে সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা বেশ ফলোৎপাদক হয়। ব্যাংকগুলো নিজেদের সম্বন্ধে বেশ আস্থাবান হয়ে উঠে। ফলে, ১৯৭৪ সালের জুন মাসে তপশিলী ব্যাংকগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দেখা যায় ৮৮৫'৩৯ কোটি টাকা। এর সাথে তুলনীয় হচ্ছে : ১৯৭৩ সালের জুন মাসে ৭০২'৬৮ কোটি টাকা ও ১৯৭২ সালের জুন মাসে ৫২৩'৬১ কোটি টাকা।

ব্যাংকগুলি অর্থনীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ খাতের ঋণ-চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এইভাবে, ব্যাংকগুলি বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রগুলিকে উজ্জীবিত করবার জন্য অগ্রগণ্য খাতগুলিতে উদারভাবে ঋণ-সুবিধা দিতে থাকে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি

বিবরণীর বছরে নিম্নলিখিতভাবে ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি পায় :

ব্যাংকের নাম	অনুমোদিত মূলধন	প্রারম্ভিক পরিশোধিত মূলধন	বর্ধিত পরিশোধিত মূলধন
সোনালী ব্যাংক	৫ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা	৩ কোটি টাকা
অগ্রণী ব্যাংক	৫ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা	৩ কোটি টাকা
জনতা ব্যাংক	৫ কোটি টাকা	১'৫ কোটি টাকা	৩ কোটি টাকা
রূপালী ব্যাংক	৫ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা
পূবালী ব্যাংক	৫ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা
উত্তরা ব্যাংক	৫ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা

ব্যাংক শাখার প্রসার

বিবরণীর বছরে দেশে ব্যাংক সুবিধাদির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। ১৯৭৩ সালের জুন মাস থেকে মোট ১৯৬টি নূতন ব্যাংক শাখা খোলা হয়। এর সাথে তুলনা করা যায় গত বছরের ১০৪টি শাখা। ৩০-৬-৭৩ তারিখে দেশে ব্যাংক শাখার মোট সংখ্যা যেখানে ১২৯৫ ছিল, সেখানে ১৯৭৪ সালের জুন শেষে এই সংখ্যা গিয়ে পৌঁছে ১৪৯১* এ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আরও দু'টি শাখা বিদেশে খোলা হয় এবং এই নিয়ে বিদেশে শাখার সংখ্যা ৬টি হয়। শাখাগুলি হচ্ছে :

ব্যাংকের নাম	অবস্থান
(ক) পূবালী ব্যাংক	লণ্ডন
(খ) পূবালী ব্যাংক	বার্মিংহাম
(গ) উত্তরা ব্যাংক	লণ্ডন
(ঘ) উত্তরা ব্যাংক	বার্মিংহাম
(ঙ) জনতা ব্যাংক	লণ্ডন
(চ) জনতা ব্যাংক	বার্মিংহাম

এ ছাড়া, পূবালী ও উত্তরা ব্যাংক ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালী নাগরিকদের সঞ্চয়কে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে (হোম রেমিটেন্স স্কীমের অধীনে) উক্ত দেশের নিম্নোক্ত ৭টি স্থানে সংগ্রহ কেন্দ্র খোলে। এগুলি খুব কার্যকর হয়।

ব্যাংকের নাম	অবস্থান
পূবালী ব্যাংক	(১) ব্রাডফোর্ড
	(২) ম্যানচেষ্টার
	(৩) ইষ্ট লণ্ডন
উত্তরা ব্যাংক	(১) ব্রিকলেন
	(২) ব্রাডফোর্ড
	(৩) ওল্ডহাম
	(৪) ম্যানচেষ্টার

১৯৭৩-৭৪ সালে ১১টি তপশিলী ব্যাংকের মোট ১৪৭৬টি শাখা সারা দেশ জুড়ে কাজ করে। ব্যাংকগুলির মধ্যে ছিল ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক এবং অবশিষ্ট ৩টি ছিল

* এই সব শাখার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং সহকারী তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক পরিচালিত কার্যরত নয় এমন ভারতীয় ব্যাংকের শাখাসমূহ।

বিদেশী ব্যাংক। দেশের প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে ব্যাংক-সুবিধা সম্প্রসারণের জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়িত করবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বাধীনতা-উত্তর কালে শাখা খুলতে দেওয়ার যে নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছিল, তাকে আরও পুনর্বিন্যাস ক'রে সুষ্ঠতর এক নীতি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রবর্তিত এই নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে তপশিলী ব্যাংকগুলির প্রতি এক নির্দেশ জারি করে যে, তারা তাদের আমানতের আকার, নূতন শাখা খোলার ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনা-ক্ষমতার ভিত্তিতে এক নির্দিষ্ট অনুপাতে নগর ও শহরের ব্যাংকযুক্ত অঞ্চলগুলিতে শাখা খোলার সাথে সাথে ব্যাংক নেই এমন পল্লী অঞ্চলেও শাখা খুলতে বাধ্য থাকবে। এই নূতন স্কীমের কার্যকারিতার মূল্যায়ন এখনও হয়নি।

পুনর্বাসনমূলক ঋণ দান

বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দান করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের তপশিলী ব্যাংকগুলি বেসরকারী নাগরিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উদারভাবে ছোট আকারের ঋণ দিতে থাকে। সম্পত্তির বিপরীতে এই সব ঋণগুলি দেওয়া হয়—বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার পুনর্গঠন এবং ঘরবাড়ী পুনর্নির্মাণের জন্য। ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাংকগুলি ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আগাম ঋণ দেয়। অর্থনীতির পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তপশিলী ব্যাংকগুলি মোট ৪,৩২৭ ব্যক্তিকে ৪.৫৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্র অংকের ঋণ দেয়।

ব্যাংক পরিদর্শন

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির নিয়মিত পরিদর্শন শুরু হয়। ২টি ব্যাংকের পরিদর্শন রিপোর্ট তৈরী করা হয় এবং সরকারের কাছে সেগুলি পেশ করা হয়। বিবরণীর বছরে অপর ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিদর্শন কাজ শুরু করা হয়। আশা করা যায় এসব রিপোর্ট শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে।

পাট শিল্পে অর্থ যোগান

১৯৭৩-৭৪ পাট মওসুমে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকগুলি থেকে পাট শিল্পের উন্নয়নের জন্য মোট ২৩৫.৯০ কোটি টাকা অর্থ যোগানের বন্দোবস্ত করে। উপরোক্ত অংকের মধ্যে ১৫৯.৪০ কোটি টাকা আসবে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে এবং ব্যাংকগুলির সম্পদ পরিপূরণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিল পুনর্বাটাকরণ স্কীমের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৭৬.৫০ কোটি টাকার পাল্টা অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করে দিবে। বছরের শেষ চার মাসে পাল্টা অর্থ যোগানের পরিমাণ ৭১.৫০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়।

চা শিল্পে অর্থ যোগান

বিবরণীর বছরে, স্বাধীনতাযুদ্ধকালে মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চা-শিল্প, উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নতি করে। ১৯৭২-৭৩ সালে চা-শিল্পকে উদারভাবে যে রেয়াতী ও অর্থ সহায়তা দেওয়া হয় তার ফলে এই শিল্প যুদ্ধকালীন ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠ্তে সমর্থ হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এই শিল্পকে ৫ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ দেয়।

কৃষি ঋণ কার্যক্রম

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদারভাবে পাল্টা অর্থ যোগানের সুবিধা দান করে। এই নীতি গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান গুলির ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা খুবই সীমিত ছিল। বিশেষ করে, বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংকের তেমন কোন তহবিলই ছিল না। তার কারণ, সাবেক পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের অংশ হিসাবে এর তহবিল নিয়ন্ত্রণ করা হোত করাচীর প্রধান কার্যালয় থেকে। ঢাকায় কোন তহবিল ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া, স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশে যে গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছিল, তার দরুন ঋণ পরিশোধ পরিস্থিতি মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। ১৯৭৩-৭৪ রাজস্ব বছরে দেশের ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ নীতি সংশোধন করা হয়। ঋণ-দান প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন সময়ে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তারা ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর এতটা নির্ভরশীল না হয়ে আমানতগুলি কাজে লাগায় এবং ঋণ-পরিশোধমূলক তৎপরতা বাড়িয়ে নিজস্ব তহবিল পুনর্গঠন করে। ফলে, গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তরফ থেকে অর্থ প্রদান এবং মঞ্জুরী বেশ খানিকটা হ্রাস পায়। ১৯৭২—৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনামূলক অবস্থা নিম্নের টেবিলে দেখানো হোল :

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ অনুমোদন ও অর্থ প্রদান

(কোটি টাকার হিসাবে)

প্রতিষ্ঠান	১৯৭২-৭৩		১৯৭৩-৭৪	
	অনুমোদিত অংক	প্রদত্ত অংশ	অনুমোদিত অংক	প্রদত্ত অংশ
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক	১৪·০০	১৪·২২*	১১·০২	৬·৫০
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৭·০০	১৫·৭৮	১৩·৭৫	১৩·২২
মোট	৩১·০০	৩০·০০	২৪·৭৭	১৯·৭২

* গত বছরের অনুমোদিত অংকের বিপরীতে প্রদত্ত অংশও এর মধ্যে রয়েছে।

ঋণ আদায়

বিবরণীর বছরে যথাক্রমে ১০·৫৬ কোটি ও ৮·০১ কোটি টাকা পরিশোধ করার কথা ছিল জাতীয় সমবায় ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের। জাতীয় সমবায় ব্যাংক পরিশোধ করে ৭·২১ কোটি টাকা এবং অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ থেকে যায় ৩·৩৫ কোটি টাকা। গত ১৯৭৩ সালের জুন মাসে দেয় ৪·১১ কোটি টাকাসহ বছর শেষে জাতীয় সমবায় ব্যাংকের কাছে মোট পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭·৪৬ কোটি টাকা। অপর দিকে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিশোধ করে ৬·৫১ কোটি টাকা এবং বছরান্তে এর কাছে দেয় থেকে যায় ১·৫০ কোটি টাকা।

স্বাধীনতার পর সরকার এই প্রথম জাতীয় সমবায় ব্যাংককে ৬·৬০ কোটি টাকার নূতন ঋণ দেয়। উদ্দেশ্যঃ এই ব্যাংক যাতে করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে গ্যারান্টিযুক্ত বন্দোবস্ত অনুযায়ী তার দায় পরিশোধ করে দিতে পারে। উপরোক্ত অংক ও স্বল্প মেয়াদী দায়কে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাবে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে পরিশোধিত ১·১৭ কোটি টাকাসহ জাতীয় সমবায় ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত টাকার প্রকৃত অংক দাঁড়ায় ৬·০৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার ছিল আগেকার ৩·২৮ কোটি টাকার দায়।

পরিদর্শন

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মোট ২৮ টি শাখা পরিদর্শনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিবরণীর বছরেই এই পরিদর্শন কাজ শেষ হয়। ঋণগুলি যথাযথ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করে দেখা হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যে সকল শাখায় পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করা হয় পরিদর্শন-দল সে-সব অঞ্চলের ২৪টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকেও সীমিতভাবে পরিদর্শন পরিচালনা করে। উদ্দেশ্য ছিল তাদের আদায় পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে অবাহিত হওয়া। এ ছাড়া দশটি থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সম্বন্ধে সমীক্ষা করে দেখা হয়

ঢাকা কেন্দ্রীয় সমবায় অঞ্চলে ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত সমস্যাদির বিষয়ে মূল্যায়ন করে দেখবার জন্য একটি বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে আটটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও বেশ কিছু সংখ্যক খামার সফর করা হয়। এ বছরে পরিদর্শন বিভাগ দু'টি পৌর সমবায় ব্যাংকে বিশেষ ধরনের পরিদর্শন কাজ চালায়। ব্যাংক দু'টি হচ্ছে : ঢাকা বানিজ্যিক সমবায় ব্যাংক ও ঢাকা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংক। উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থান সম্পর্কিত ১৯৭৪-৭৫ সালের একটি ঋণ কর্মসূচীও মূল্যায়ন করে দেখা হয়।

লাইসেন্স প্রদান

বিবরণীর বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক নূতন শাখা স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে ৪৫টি লাইসেন্স দেয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৩৫টি শাখা স্থাপনে সমর্থ হয় এবং তার ফলে এ বছরের শেষে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭টি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কৃষিতে অর্থ যোগান

বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে কৃষিতে অর্থযোগানে উদ্বুদ্ধ করা। যদিও আমাদের জাতীয় আয়ের এক বিরাট অংশ আসে কৃষি থেকে, তথাপি, এই খাতে অর্থ যোগানের ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সবসময়ে অনীহা প্রকাশ করে এসেছে। খামার উন্নয়নকল্পে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে লিপ্ত করার সম্ভাব্যতা যাচাই-এর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিভিন্ন ঋণ-দান সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ডিভিশন ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এইমর্মে সুপারিশ পেশ করে যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষিতে অর্থযোগানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অন্য ঋণ-দান সংস্থার মাধ্যমে অর্থ যোগাতে থাকবে। পরে প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে উঠলে তারা সরাসরি অর্থ যোগাবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষিতে অর্থ যোগানের ব্যাপারে উৎসাহ দিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্কীম গ্রহণ করে। এই স্কীমের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি থেকে তাদের ঋণের আদায়কৃত অংশের উপর শতকরা ১½ ভাগ সুদ-সহায়কী দান করবে। ১৯৭৪ সালের ২১শে জুন তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ সংস্থাগুলিকে রেয়াতী হারে পাল্টা অর্থযোগান দেওয়া প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে, এখন থেকে তাদের পাল্টা অর্থযোগান দেওয়া হবে ব্যাংকের প্রচলিত হার অনুসারে।

রাজস্ব উন্নয়ন বাজেট

১৯৭৩ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৭৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয় ৪১১.৩১ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ধরা হয় ২৯৫.৩০ কোটি টাকা। এতে উদ্বৃত্ত দেখানো হয় ১১৬.০১ কোটি টাকা। ১৯৭৩-৭৪ সালের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় হিসাব করা হয় ৩৭৭.৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে রেল ব্যবস্থা থেকে আসবে ৩০.৪২ কোটি টাকা। সংশোধিত ব্যয়ের হিসাবে দেখানো হয়েছে ৩৬৪.৩৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩৩.৬৩ কোটি টাকা রেলওয়ে সংক্রান্ত ব্যয়।

১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্যয় নির্ধারিত হয় ৫২৫'৩৫ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মোট বরাদ্দের শতকরা ২৩'৬৪ ভাগ নির্ধারিত হয় পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য; শতকরা ১৯ ভাগ কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য; শতকরা ১৫ ভাগ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের জন্য; শতকরা ১১'৫৭ ভাগ বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য, শতকরা ১১'৩২ ভাগ শিল্পের জন্য এবং শতকরা ৬'৬১ ভাগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য।

১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটে বর্তমান শুল্ক ও হারের ভিত্তিতে রাজস্ব আয় ধরা হয় ৪৭০'২৩ কোটি টাকা। রাজস্ব ব্যয় ধরা হয় একই অংকের এর ফলে একটি সুষম বাজেট তৈরী হয় বিভিন্ন কর থেকে যে রাজস্ব আয় হিসাব করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে: আমদানী কর ১৪৫ ০০ কোটি টাকা; আবগারী কর ১২৭'৫৫ কোটি টাকা; আয়কর, কর্পোরেশন কর ও কৃষি আয়কর বাবদ ২৪'২৫ কোটি টাকা এবং বিক্রয় কর বাবদ ৪৬'০০ কোটি টাকা।

১৯৭৩-৭৪ সালের ৩৬৪'৩৯ কোটি টাকার সংশোধিত রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য রাজস্ব ব্যয় ধরা হয় ৪৭০ ২৩ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের মধ্যে প্রতিরক্ষা বাবদ বরাদ্ধ কর হয় ৭১'০০ কোটি টাকা এবং শিক্ষা খাতে ৮১'৪৮ কোটি টাকা। অন্যান্য ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে: স্বাস্থ্য (১৯'২২ কোটি) ও গণপূর্ত (১২'৯৭ কোটি)। তাছাড়া, অপ্রত্যাশিত আবর্তক ব্যয় (recurring expenditure) বাবদ বরাদ্দ থাকে ১৫ কোটি টাকা এবং ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত করবার জন্য।

৫২৫'০০ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটে কৃষি ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান খাতে ৯১'৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালের কৃষি কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ১৪৪ লক্ষ টনে উন্নীত করা। এই কার্য্যক্রমকে সফল করে তুলবার জন্য ১৪ লক্ষ একর জমিতে ৪০,০০০টি পাওয়ার পাম্প বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কৃষিখাতে ৪,১৪২টি গভীর ও ৫,৬৫২টি অগভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৯৭'০০ কোটি টাকা। বাজেটে ৭১'৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। ৮০'০০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে পানি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। বাজেটে প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ৭১'০০ কোটি টাকা রয়েছে শিল্পখাতের জন্য ও ৮'৫০ কোটি টাকা রয়েছে জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

আশা করা গিয়েছিল যে, ৫২৫ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার চাহিদা মেটাবার জন্য বাংলাদেশ ৩৯৪ কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্য লাভ করবে এবং সেই অনুসারে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের মাধ্যমে উন্নয়ন-ব্যয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো।

১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটে নিম্নলিখিত অর্থ প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

(১) চায়ের উপর আবগারী কর পাউণ্ড প্রতি ৫০ পয়সা থেকে ৭৫ পয়সায় উন্নীত করা হয়।

(২) সিমেন্টের উপর আবগারী কর টন প্রতি ৩৬ টাকা থেকে ২০৩ টাকায় উন্নীত করা হয়। এই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সিমেন্ট ও আমদানীকৃত সিমেন্টের মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা।

(৩) দেশে উৎপাদিত ঢেউ টিন ও আমদানীকৃত ঢেউ টিনের দামের মধ্যে সমতা আনবার জন্যে আমদানীকৃত ঢেউ টিনের উপর করের হার শতকরা ২০ ভাগ থেকে শতকরা ৪৫ ভাগে উন্নীত করা হয়।

(৪) বার্ণিশ ও রঙের উপর আবগারী কর শতকরা ২২ ভাগ থেকে শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত করা হয়।

(৫) গ্যাসের উপর আবগারী কর প্রতি এক হাজার ঘনফুটের জন্য ৪০ পয়সা থেকে ২.৪০ টাকায় উন্নীত করা হয়।

(৬) চিনির উপর আবগারী শুল্ক হন্দর প্রতি ১৪.০০ টাকা থেকে ৭০.০০ টাকায় উন্নীত কর হয়।

(৭) রেডিও ও টেলিভিশন সেটের উপর আবগারী কর সেটের মূল্যানুযায়ী যথাক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ ও ৩০ ভাগ বাড়ানো হয়।

(৮) আবাসিক বাড়ীর উপর কর ধার্য করা হয়। বাড়ী ভাড়া মাসিক ৩০১ টাকা থেকে ৭০০ টাকার মধ্যে হলে কর দিতে হবে শতকরা ১০ ভাগ বাড়ীর ভাড়া মাসিক ৭০১ টাকা থেকে ১,০০০ টাকার মধ্যে হলে কর দিতে হবে শতকরা ১৫ ভাগ এবং বাড়ী ভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ ১,০০০ টাকার উপরে হলে কর দিতে হবে শতকরা ২০ ভাগ। ৩০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ী ভাড়া এই কর থেকে রেহাই পাবে।

(৯) যে সব বাঙালী কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন এক লক্ষ টাকার নীচে অথবা ৩৫ লক্ষ টাকার উপরে নয় তাদের শিল্পগুলির জন্য ৫ বছর কোন আয়কর দিতে হবে না।

(১০) বৈদ্যুতিক পাখার উপর মূল্যানুযায়ী শতকরা ১৫ ভাগ হারে আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়।

(১১) প্রতিটি লাইসেন্সের মূল্যানুযায়ী শতকরা ২০ ভাগ হারে আমদানী লাইসেন্স কর ধার্য করা হয়।

(১২) বিদেশে সফর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে কেনা টিকিটের উপর শতকরা ৩০ ভাগ হারে বিনিময় কর ধার্য করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট কারণে প্রদত্ত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার উপর একই হারে এই কর ধার্য করা হয়।

(১৩) রেজিষ্ট্রীকরণ ফি গড়ে শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়।

(১৪) বাস, ট্রাক, লরী, মোটর সাইকেল ও মোটর গাড়ীর উপর প্রযোজ্য আবগারী করের হার নিম্নরূপ: প্রতিটি লরী, বাস, ট্রাক ও চেসিসের জন্য ২০০০.০০ টাকা ও প্রতিটি মিনিবাস,

জীপ, ভ্যান, ষ্টেশন ওয়াগনের জন্য ১০০০'০০ টাকা এবং প্রতিটি মোটর গাড়ীর জন্য ৫০০০'০০ টাকা। দেশের অভ্যন্তরে এ্যাসেম্বল করা স্কুটার ও মোটর সাইকেলের উপর শতকরা ৭½ ভাগ কর আদায় করা হবে।

সরকারের ঋণ

৯৭৪-এর ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরে সরকার কোন নতুন ঋণপত্র ছাড়েননি। সরকার ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম বারের মত উল্লেখ্য যে একটি '৫½% ঋণ—১৯৮২' সৃষ্টি করেন তাতে ৬৩,৭৫,০১,০০০'০০ টাকা পাওয়া যাবে। শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হার সুদে সরকার বাজারে যে ত্রৈমাসিক ট্রেজারী বিল ছাড়েন ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯.৪৫ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন সরকার মোট ২৫'০০ কোটি টাকার অনুরূপ বিল ছেড়েছিলেন এই বিল ৩ মাস অন্তর অন্তর আবার বিক্রী হচ্ছে। গত বছর পাকিস্তানী নোটের বদলে বাংলাদেশের মুদ্রা প্রবর্তন করার জন্য ও অন্যান্য কারণে যে সম্পদ সৃষ্টি করতে হয় তার পরিমাণ ২৫৫'০৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩৫৪'১২ কোটি টাকায় এসে দাঁড়ায়। অনুরূপ বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে এই যে, সরকার 'ওয়েজ এণ্ড মীন্‌স' নামীয় আগামের অধীনে অনুমোদিত অর্থের থেকে ১০ কোটি টাকা বেশী তুলে ফেলায় শতকরা ৩ ভাগের এক বিশেষ ট্রেজারী বিল ছাড়তে বাধ্য হন।

১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে সরকারকে প্রদত্ত 'ওয়েজ এণ্ড মীন্‌স' নামীয় আগামের পরিমাণ ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়, অর্থাৎ ২০'০০ কোটি টাকা।

সরকারী নিশ্চয়তাপত্র পুনর্বৈধকরণ

যে সব বাঙালী পাকিস্তান আমলের নিশ্চয়তাপত্র কিনেছিলেন তাঁদেরকে সুবিধা দেবার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিশ্চয়তাপত্র ভাঙানো, পুনর্বৈধকরণ ও পরিশোধের ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন :

(ক) ১৯৬৬ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ইস্যুকৃত "৫½% পূর্ব পাকিস্তান ঋণ, ১৯৭৩" মুক্তি যুদ্ধকালীন সময় বাদে, ১৯৭৪ সালের ২৭শে এপ্রিলে পরিশোধযোগ্য হয়ে পড়ে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা সার্কেলের গ্রাহকদের জন্য ১,০৬,৮০,৫০০'০০ টাকার পরিশোধ-দায় গ্রহণ করেন, তবে শর্ত থাকে যে, গ্রাহকগণ বাঙালী নাগরিক/প্রতিষ্ঠান এবং তারা অর্থমন্ত্রণালয়ের ১৯৭২ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি নং এম, এফ, ডি, আই/আই এম—৭/৭২/২৩ (২৫০) অনুযায়ী তাদের নিশ্চয়তাপত্রগুলি জমা করেছিলেন।

(খ) (/০) যে সব বাঙালী নাগরিক/প্রতিষ্ঠানের কাছে সরকারী অঙ্গীকার পত্র/ষ্টক সার্টিফিকেট ইত্যাদি ছিল এবং যেগুলির মেয়াদ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পূর্ণ হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে অনুসৃত পদ্ধতিতে অর্থ পরিশোধ করে দেয়। তবে এ সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের চূড়ান্ত দায়কে বাতলি করা হয়নি।

(ঘ/০) ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে অথবা তার পূর্বে বাঙালী নাগরিক/প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রাক্তন পাকিস্তান সরকারের যে সব অঙ্গীকারপত্র/ষ্টক সার্টিফিকেট ছিল এবং যেগুলির মেয়াদ পরবর্তী সময়ে পূর্ণ হয় পাকিস্তানের চূড়ান্ত দায়কে পূর্ববত রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে সেগুলি পুনর্বৈধ বলে ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় এই হিসাবের বাইরে থাকে।

(গ) অনুরূপভাবে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বা তৎপূর্বে পাকিস্তান সরকারের যে সব আয়কর বণ্ড বাঙালী নাগরিক/ তিষ্ঠানাদির কাছে ছিল এবং যেগুলির মেয়াদ তৎপরবর্তী সময়ে পূর্ণ হয় সেগুলি পুনর্বৈধকরণের সীদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পুনর্বৈধকরণ

যে সব ডিফেন্স সার্টিফিকেট ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বা তার পূর্বে বাঙালী নাগরিকরা কিনেছিলেন এবং যেগুলি ২৩/১১/১৯৭২ তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিঘোষিত এবং ব্যাংক/ডাকঘরে জমাকৃত হয় সেগুলির পুনর্বৈধকরণ হয়। তবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় এই হিসাবের বাইরে থাকে। ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে এগুলি ভাঙানোর অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রাইজবণ্ড, এন, আই, টি ইউনিট ও আই, সি, পি মিউচ্যুয়েল ফাণ্ড সার্টিফিকেটের বদলে সঞ্চয়পত্র ইস্যু

১৯৭২ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ব্যাংক/ডাকঘর/বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থায় সকল প্রাইজবণ্ড, এন, আই, টি ইউনিট এবং আই, সি, পি, মিউচ্যুয়েল ফাণ্ড সার্টিফিকেট জমা দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে এইসব প্রাইজবণ্ড, এন, আই, টি ইউনিট ও আই, সি, পি মিউচ্যুয়েল ফাণ্ড সার্টিফিকেটের বদলে সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হয়।

প্রাইজবণ্ড প্রবর্তন

১৯৭৪ সালের ১লা জুন তারিখ থেকে দশ টাকা মূল্যের বাংলাদেশ প্রাইজবণ্ড প্রবর্তন করা হয়। প্রাইজবণ্ডগুলি ভাঙানোর অর্থে বহনযোগ্য এবং বাংলাদেশ সরকারের ঋণ হিসেবে এগুলি প্রবর্তিত হয়। এর জন্য সরকারকে কোন সুদ দিতে হবে না কিন্তু বৎসরের প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ ১৪ই মার্চ, ১৪ই জুন, ১৪ই সেপ্টেম্বর ও ১৪ই ডিসেম্বর এগুলির উপর এক একবার করে

লটারী অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ড্র অনুষ্ঠিত হবার তারিখ ছিল ১৯৭৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। প্রতিটি সিরিজে বিভিন্ন মূল্যের ১২০টি পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ড্র-তে মোট ৫০,০০০'০০ টাকার পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

মূল্য পরিশোধ পরিস্থিতি

১৯৭২-৭৩ সালের ১২'৪ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে "বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রায় পরিশোধ ক্ষমতা" শীর্ষে ঘাটতি দেখা যায় সংসমেত ৬৩'৮ কোটি টাকা। এই অবনতির কারণ হচ্ছে, পণ্যদ্রব্য আমদানী বাবদ ২৫০'৮ কোটি টাকার ঘাটতি; যদিও এই ঘাটতি বহুলাংশে লাঘব পেয়েছে পুঁজি লেনদেন অধীনে ১৯২'১ কোটি টাকা আয় বাড়ার ফলে এবং অপরিশোধ্য পুঁজি স্থানান্তরণের ফলে আয় বেড়েছিল ৭ ৩ কোটি টাকা।

সর্বসমেত ৬৩'৮ কোটি টাকা ঘাটতির পটভূমিতে মনিটরী মুভমেন্টে অবনতির নীট পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে ৭৯'৪ কোটি টাকা এবং ফলে 'ভুল ও ছাড়' শীর্ষে অবশিষ্ট ১৫'৬ কোটি টাকার ভুক্তি ঘটেছে। বিবরণীর বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং সংরক্ষিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার পরিমাণ কমে গিয়ে ৬৩'০০ কোটি টাকায় নেমে আসে। অপরদিকে, অন্যান্য অর্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্প মেয়াদী সম্পদ বেড়ে গিয়ে ১৩'৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এবং অন্যান্য অর্থ প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের নীট দায় বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৯'৩ কোটি টাকা এবং ০'৪ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রতি আমাদের দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির মূল কারণ হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ১৯৭৪ সালের জুন মাসে ষ্টাণ্ডবাই ব্যবস্থাধীনে ড্র করা। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রতি ২৮'৪ কোটি টাকার ড্র-জাত দায় বাদ দিয়ে ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার পরিমাণ কমে যায় ৯১'৪ কোটি টাকা।

গত বছরের ২০২'৮ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে পণ্য লেনদেন বাবদ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১৫'২ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে আমদানী ব্যয় ১৭৯'১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬৬৭'৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায় এবং রপ্তানী আয় ৩৩'৩ কোটি টাকা থেকে কমে ২৫২'৩০ কাটি টাকা দাঁড়ায়। এই কারণেই পরিশোধ-ক্ষমতা এতটা হ্রাস পায়।

১৯৭৩ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে রপ্তানী আয় (বিনিময় বাণিজ্য সহ) গতবছরের ২৮৫'৬ কোটি টাকার তুলনায় ২৫২'৩ কোটি টাকায় নেমে আসে। রপ্তানী আয় কমে যাওয়ার মূল কারণগুলির মধ্যে রয়েছে জাহাজ পরিবহণ সম্পর্কিত অসুবিধা, আভ্যন্তরীণ পরিবহণ সম্পর্কিত বাধা-বিপত্তি এবং ভারতের সাথে যে "সুষম বাণিজ্য এবং পরিশোধ চুক্তি" সম্পন্ন হয় তার অধীনে নির্ধারিত পরিমাণের তুলনায় কম পরিমাণে ভারতে কাঁচা পাট রপ্তানী করা হয় বলে।

বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য থেকে যে রপ্তানী আয় সম্ভব হয়েছে তার বিবরণী নিম্নরূপ : ১৯৭২-৭৩ সালের ১৫৪'৮, ১০১'২ ও ১০'৫ কোটি টাকা আয়ের তুলনায়, পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা পাট এবং চামড়া (শুকানো) থেকে আয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে যথাক্রমে ১২৬'৯, ৮৪'৬ এবং ৭'৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে মাছ এবং পশুচর্ম ও চামড়া থেকে আয় যথাক্রমে ৫'২ কোটি এবং ৩'৫ কোটি টাকা বেড়ে গিয়ে ৯'২ কোটি এবং ৭'২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য দ্রব্যের ব্যাপারে ৫'৭ কোটি টাকা আয় বেড়ে গিয়ে ১৭'১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৭৩-৭৪ সালে পরিশোধের ব্যাপারে ঘাটতির পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ সালের ৩৮'১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে ৭৬'৫ কোটি টাকা হয়।

পরিশোধ বাবদ প্রাপ্তির তুলনায় পরিশোধ দায় যথেষ্ট পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এমনটি হয়। পরিশোধ খাতে বৃদ্ধি পায় আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিবহণের ভাড়া (১৭'০ কোটি টাকা), অন্যান্য পরিবহণ খরচ (১০'৪ কোটি টাকা) লগ্নী আয় (৩'8 কোটি টাকা) এব অন্যান্য দায় (৫'৩ কোটি টাকা)। শেষোক্ত দায়টি সরকারী এন, ই, আই বাবদ (২ ৫ কোটি টাকা) এবং বৈদেশিক সফর বাবদ (১'৬ কোটি টাকা) প্রাপ্তির ফলে কিছুটা সহজতর হয়। প্রাপ্তির বেলায় লগ্নী আয়, সরকারী এন, ই, আই ও অন্যান্য দায় কমে যায় যথাক্রমে ০'৫ কোটি, ৭'৬ কোটি এবং ১'৮ কোটি টাকার মতো ; অপর দিকে, অন্যান্য পরিবহণ ও সফরবাবদ ব্যয় বেড়ে যায় যথাক্রমে ১'৫ কোটি ও ১'০ কোটি টাকা।

অপরিশোধযোগ্য পুঁজি স্থানান্তর থেকে আসে মোট ১৯৬'৩ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় এই আয় বৃদ্ধি পায় ৭'৩ কোটি টাকা। সরকারী লেনদেন বাবদ প্রাপ্তি ১৮'৬ কোটি টাকা বেড়ে গিয়ে ১৮০'৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, বেসরকারী পুঁজি স্থানান্তর থেকে আয় ১১'৩ টাকা কোটি কমে গিয়ে ১৫'৪ কোটি টাকায় নেমে আসে। হোম রেমিটেনস প্রিমিয়াম স্কীমের অধীনে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়াতেই বেসরকারী পুঁজি স্থানান্তরণজাত আয় এতটা কমে আসে।

বিবরণীর বছরে ঋণ আদায় বাবদ প্রাপ্তির মোট ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৩'৯ কোটি টাকা। গত বছরের এর পরিমাণ ছিল ৪৪'০০ কেটি টাকা। সরকারের অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ/দায় থেকে নীট ২৭'৭ কোটি টাকা আসে।

আমদানী ও রপ্তানী নীতি

১৯৭৩-৭৪ সালের আমদানী নীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উদার করে তোলা হয়। ১৯৭৩ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মওসুমে আমদানী ব্যয়ের মোট পরিমাণ ধরা হয় ২১৫'০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৬৯'৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় ভোগ্য পণ্য আমদানীর জন্য এবং ১৪৫'২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় কাঁচামাল আমদানীর জন্য। অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে বেশ কতকগুলো নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়—যেমন, কাপড়, সূতা, অষুধপত্র, চিনি, ভোজ্য তেল, বীজ,

নারিকেল তেল, কয়লা, সিমেন্ট, সোডা, বই, সাময়িকী ইত্যাদি। এ ছাড়াও অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে বস্ত্র, শিল্প, পাট, সার, রিফাইনারী, চিনি, সিমেন্ট, সিগারেট, শিপইয়ার্ড, ডিজেল ইঞ্জিন এবং পাম্পের জন্য কাঁচামাল এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ আমদানীর উদ্দেশ্যে শতকরা ১০০ ভাগ লাইসেন্স দেওয়া হয়।

লাইসেন্স ব্যবস্থা বাদেও বিশেষ কতকগুলো দ্রব্য আমদানী ত্বরান্বিতকরণের জন্য নূতন ক্রয় নীতি গ্রহণ করা হয়। ৩০টি দ্রব্য যা পূর্বে টি, সি, বি, আমদানী করতো যেমন—ব্যাটারী, ছাপার কালী, লোহার জিনিস, রঙ এবং রাসায়নিক দ্রব্য সেগুলির আমদানী বেসরকারী খাতের আওতায় নিয়ে আসা হয়। তাছাড়া টি, সি, বি, আমদানী করতে পারে এমন ১৩টি দ্রব্য আমদানী করার ব্যাপারে সেক্টর কর্পোরেশনকেও অনুমতি দেয়া হয়। চা, চামড় ও মৎস্য শিল্পের মত রপ্তানী শিল্পগুলিকে শতকরা ১০০ ভাগ লাইসেন্স দেওয়া হয়।

১৯৭৪ সালের জানুয়ারী-জুন মওসুমে আমদানী নীতির মূল লক্ষ্য ছিল সরকারী এবং বেসরকারী খাতের সকল শিল্পকে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামাল আমদানীর যথাযথ সুবিধা দান পূর্বক দেশের শিল্প উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। ৩২৩'৪৮ কোটি টাকা পরিমাণ মোট বরাদ্দের মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানী করার জন্য বরাদ্দ পায় ১০৫'৫৩ কোটি টাকা। বেসরকারী খাতে অনুরূপ বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১'২৫ কোটি টাকা এবং ৬৫'০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার্য তুল, সূতা, বিলেট এবং তৈলবীজ আমদানীর উদ্দেশ্য। ৮১'৭০ কোটি টাকা বাণিজ্যিক আমদানী বরাদ্দের মধ্যে ৭৯'২০ কোটি টাকা ব্যবহৃত হবে কাপড়, কয়লা, সিমেন্ট, চিনি, ওষুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, নারিকেল, ভোজ্যতৈল, অটোমোবাইল এবং সাইকেলের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, টায়ার, টিউব, বই, সাময়িকী সোডা এ্যাস, মশলা, ঢেউটিন ও অন্যান্য বাণিজ্য-পণ্য আমদানীর জন্য। কল-কারখানার জরুরী চাহিদা মিটাবার জন্য ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ আমদানী বাবদ ২'৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। খাদ্য-শস্য এবং উন্নয়ন ও উন্নয়ন-বহির্ভূত খাতে আমদানীর বিষয়টি এই নীতির আওতায় আসেনি। খাদ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে স্ব স্ব কর্মসূচী গ্রহণ করেন। দেশে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে বিদেশে বসবাসকারী বাঙালী নাগরিকদেরকে বাণিজ্যিক যানবাহন সহ যে ছয়টি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করবার সুবিধা দেওয়া হয় তা ১৯৭৩ সালের অক্টোবর ও ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে আরও সম্প্রসারণ করা হয়। ২৮টি পণ্য দ্রব্য এই স্কীমের অধীনে আনা হয়। এই সব দ্রব্যের বেশ কয়েকটির বেলায় রেয়াতী হারে আমদানীকর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

উদার আমদানী কর্মসূচী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭৩-৭৪ সালে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৩১৫ কোটি টাকা। ১৯৭২-৭৩ সালে আয় হয়েছিল ২৮৬ কোটি টাকা। ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য যে রপ্তানী আয় হিসাব করা হয়েছে, তার মধ্যে পাটজাত দ্রব্য থেকে আসবে আনুমানিক ১৬০'০০ কোটি টাকা।

কাঁচা পাট থেকে আসবে ১১৫'০০ কোটি টাকা। অন্যান্য দ্রব্য থেকে, যথা—চা, মাছ, চিংড়ী বরফ দেওয়া ছোট চিংড়ী এবং মসলা থেকে আসবে মোট ৪০'০০ কোটি টাকার মত। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার ব্যাপারে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৭ ভাগ রপ্তানী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য দেশে লভ্য সকল অভিজ্ঞতা এবং সুবিধাকে কাজে লাগানো হয়। যেসব দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত রপ্তানী আয়ের পরিমাণ স্বাধীনতার পূর্বকালীন সময়ের আয়ের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয় এবং যেগুলি পূর্বে রপ্তানী করা হতো কিন্তু স্বাধীনতার পরে আর রপ্তানী করা হয়নি, তাদের বেলায় এফ, ও, বি রপ্তানী মূল্যের শতকরা ৩০ ভাগ নগদ সহায়কী দেওয়া হয়। ৯৭৩ সালের জুলাই মাস থেকে কার্যকরী এই নগদ সহায়কী স্কীমে অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যের সংখ্যা ১৯৭৪ সালে ৩রা মে তারিখে ৮৭ তে দাঁড়ায়। রপ্তানী ভোগ্য পণ্যের বেলায় প্রযোজ্য শুল্ক রেয়াত দেয় আগের মতই অব্যাহত থাকে। এছাড়া বাজেটে বিভিন্ন রপ্তানী কার্যক্রমে অর্থযোগানের ব্যবস্থাও রাখা হয় প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত তহবিলও পাওয়া যাবে। এতদিন পর্যন্ত সরকার রপ্তানীভিত্তিক পাট শিল্পকে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি নিরসনের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অপ্রত্যক্ষভাবে সহায়কী দান করতো ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাট শিল্পকে সরাসরিভাবে সহায়কী দানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এরজন্য ৫'০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় ৯৭৩-৭৪ সালের চা নীতিতেও নিলাম মূল্যের শতকরা ৩০ ভাগের সমান সহায়কীর বন্দোবস্ত রাখা হয় তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে সরাসরি দেয়া এই সহায়কীর পরিমাণ পাউণ্ড প্রতি ৭৫ পয়সার বেশী হবে না। "ক" শ্রেণীভুক্ত চা বাগানগুলির বেলায় উপরোক্ত সহায়কী প্রযোজ্য হবে এই শ্রেণীভুক্ত চা বাগানগুলির চা বিদেশে সর্বপেক্ষা বেশী রপ্তানী হয়। "খ" ও "গ" শ্রেণীভুক্ত (স্থানীয় মালিকানাধীন ছোট বাগান যার উৎপাদন খরচা বেশী) চা বাগানগুলি পাউণ্ড প্রতি ৭৫ পয়সার বেশী নয় এখন ভিত্তিতে উৎপাদন মূল্য এবং নিলাম মূল্যের বিয়োগফলের সমান সহায়কী পাবে।

বাণিজ্য ও পরিশোধ চুক্তি

বাংলাদেশ বেশ কিছুসংখ্যক দেশের সাথে বাণিজ্য, পরিশোধ, ঋণ এবং পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পন্ন করে। ১৯৭৩ সালের ৫ই জুলাই তারিখে ভারতের সাথে সুষম বাণিজ্য এবং পরিশোধ চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত পূর্বর্তন সীমিত আকারের পরিশোধ চুক্তি বদলে উপরোক্ত চুক্তিটি ১৯৭৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে কার্য্যকর হয়। এগুলি কার্যকর হবার দিন থেকে উভয় দেশের মধ্যে ৩ বছর ধরে ৩০ কোটি টাকার পণ্য বিনিময় ঘটবে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানী করা হবে কাঁচা পাট, মাছ, নিউজপ্রিন্ট, ইত্যাদি এবং ভারত থেকে আসবে কয়লা, তামাক, সিমেন্ট, তুলা, কার্পাস বস্ত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন দ্রব্য।

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে বেশ কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তি করে। যে-সব দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাদের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ১৯৭৩ সালের ৭ই জুলাই, ইরাকের সাথে ১৯৭৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, সেনেগালের সাথে ১৯৭৪ সালের ২৭শে মে এবং আফগানিস্তানের সাথে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে। উপরোক্ত চুক্তিগুলির লক্ষ্য হচ্ছে : পরস্পরের আমদানী দ্রব্যগুলির প্রতি "সব চাইতে সুবিধাভোগী দেশের ব্যবহার" প্রদান।

বিবরণীর বছরে বাংলাদেশ সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সাথে সুষম বাণিজ্যের ভিত্তিতে নতুন পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করে। টি, সি, বি কর্তৃক সুইজারল্যাণ্ডের সিবা-গেইগী ও এ্যাণ্ড্রে, সি, আই, ই-এর সাথে স্বাক্ষরিত বিনিময় বাণিজ্য চুক্তি, ভারতের সাথে সম্পাদিত সুষম বাণিজ্য এবং পরিশোধ চুক্তিসহ এই চুক্তিগুলির অধীনে বিনিময়কৃত পণ্য দ্রব্যের মূল্য দাঁড়াবে মোট ১৪৮ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও এজেন্সীর, সাথে যথা—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ও জাপানের ও, ই, সি, এফ-এর সাথে বেশ কয়েকটি ঋণ এবং আগামের চুক্তি সম্পাদন করে।

বিনিময় হার

১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর সাথে নতুন বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

এক পাউণ্ড = ১৮·৯৬৭৭ টাকার এই নতুন হার ঘোষিত হয়। এই বিনিময় হারের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলারদের কাছে পাউণ্ড-স্টার্লিং কেনা-বেচা করে এবং অনুমোদিত ডিলারগণ (ব্যাংক) জন-সাধারণের কাছে এই হারে লেনদেন চালায়। পাউণ্ড-স্টার্লিং কেনা-বেচার পরিবর্তিত হার ৬-৭-৭২ তারিখ থেকে কার্যকর হয়।

(১) যে হারে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলারের কাছে পাউণ্ড-স্টালিং কেনা-বেচা করে তা নিম্নরূপ :—

পাউণ্ড-স্টার্লিং ক্রয়	পাউণ্ড-স্টার্লিং বিক্রয়
তাৎক্ষণিক	তাৎক্ষণিক
১৮,৭৫০১ টাকা	১৮·৮৫০১ টাকা

(২) অনুমোদিত ডিলারগণ জনসাধারণের কাছে নিম্ন হারে পাউণ্ড স্টার্লিং কেনা-বেচা করে :

পাউণ্ড-স্টার্লিং ক্রয়		পাউণ্ড-স্টার্লিং বিক্রয়	
তাৎক্ষণিক		তাৎক্ষণিক	
টেলিগ্রাফ হস্তান্তর	১৮·৭১৪৩ টাকা	টেলিগ্রাফ হস্তান্তর	১৮·৮৮৫৭ টাকা
		এবং ও, ডি (বি, সি বাদে অন্যান্য প্রেরণ)	
টেলিগ্রাফ হস্তান্তর প্রামাণ্য	১৮·৬৮৩১ টাকা	বি, সি	১৮·৯২১৪ টাকা
ও, ডি	১৮·৬২০৬ টাকা	—	—

(গ) বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর জাহাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক এমন বাঙালী নাবিকদের বিদেশ সফর উদ্দেশ্যে বিদেশী এয়ার লাইন অফিস কোন টিকিটের মূল্য লাভ করে থাকলে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানী বিল পুনর্বাটাকরণের একটি স্কীম ১৯৭৪ সালের ১লা মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। এই স্কীমের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাক্রমে লণ্ডন ও নিউইয়র্কে পাউণ্ড-স্টার্লিং ও মার্কিন ডলারে পরিশোধযোগ্য সেইসব বিনিময় বিলগুলি ক্রয়/পুনর্বাটাকরণ করবে, যেগুলির মেয়াদ পূর্ণ হবে ক্রয়/পুনর্বাটাকরণের ৮০ দিনের মধ্যে। প্রথম শ্রেণীর বিদেশী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত অপরিবর্তনীয় লেটার অব ক্রেডিটের অধীনে পরিশোধিত বিলগুলি সাধারণতঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনর্বাটাকরণের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

(৫) ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে কার্য্যকর থাকে এমন একটি নগদ সহায়কী স্কীমও প্রবর্তিত হয়; এই স্কীমের অধীনে বিশেষ কতকগুলি দ্রব্যের রপ্তানীকারকদের ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে রপ্তানী দ্রব্যের নীট এফ, ও, বি মূল্যের শতকরা ৩০ ভাগ হারে নগদ সহায়কী দেওয়া হয়। তবে শর্ত থাকে যে, ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুলাই অথবা তার পরে ঐ সব দ্রব্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

(৬) বিদেশে বসবাসকারী বাঙালী নাগরিকদের স্বদেশে টাকা পাঠানোর যে প্রিমিয়াম স্কীম ছিল তার সময়-সীমা ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়।

বৈদেশিক সাহায্য

১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্যের হিসাব দেখানো হয়েছিল ৩৫২ কোটি টাকা, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে ২৯৮ কোটি টাকার বেশী বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে না। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির মূল হিসাব ও সংশোধিত হিসেবের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকার হিসাব)

	মূল হিসাব	সংশোধিত হিসাব
প্রকল্প সাহায্য	১২০	৯১
খাদ্য বাবদ সাহায্য	৬৩	৭৫
খাদ্য-বহির্ভূত দ্রব্য সাহায্য	১৬৯	১৩২
মোট:	৩৫২	২৯৮

প্রত্যাশিত সাহায্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম সাহায্য পাওয়া যায় প্রকল্প সাহায্যের বেলায়। ২৯ কোটি টাকা কমিয়ে প্রাপনীয় অর্থের পরিবর্তিত হিসাব দেখানো হয় ৯১ কোটি টাকা। মূল হিসাবের বিপরীতে খাদ্যবাবদ সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেলেও খাদ্য-বহির্ভূত দ্রব্য-সাহায্যের ব্যাপারে প্রাপ্তি আশাব্যঞ্জক নয়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে লেনদেন

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে 'ষ্টাণ্ডবাই' চুক্তি সম্পাদন করে এবং তহবিলের ৩১'২৫ মিলিয়ন প্রথম ঋণ কিস্তির অধীনে ২৯'১৫ মিলিয়ন এস ডি আর তুলে নেয়। তহবিলে বাংলাদেশের অংশে রয়েছে ১২৫ মিলিয়ন এস ডি আর। ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে তহবিলের কাছে ৯৩'৬৫ মিলিয়ন এস ডি আর-এর সমান বাংলাদেশ টাকা ছিল, যে টাকা আবার পুনরায় ক্রীত হতে পারে। এই হিসাবের মধ্যে আবার ছিল অনুমোদিত স্বর্ণ ঋণ-সীমার অধীনে তুলে নেওয়া ২ মিলিয়ন এস ডি আর এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের রপ্তানী-বিপর্যয় প্রতিরোধকল্পে তহবিল কর্তৃক যে ক্ষতিপূরণমূলক অর্থযোগান দেওয়া হয় তার অধীনে ৬২'৫ মিলিয়ন এস ডি আর।

চাকরির শর্তাবলী উন্নয়ন ও সমাজ সেবামূলক কাজ

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় গ্রেডসমূহের ষষ্ঠ থেকে দশম মানের গ্রেডগুলি প্রবর্তন করে। এই পরিবর্তনের আওতায় ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে সহকারী ট্রেজারার ও 'বি', 'সি' এবং 'ডি' শ্রেণীভুক্ত কর্মচারিগণের পুর্বতন বেতন ও ভাতার হার পুনর্নির্ধারিত হয়।

প্রত্যাগত বাঙালী কর্মচারী

সাবেক পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাংকের সকল বাঙালী কর্মচারীরা যারা পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত এবং যারা বিবরণীর বছরে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাদেরকে ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসে অস্থায়ী ভাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। তারা পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাংকে যে পদে বহাল ছিলেন তার সমমানের পদে তাদের নেওয়া হয়। তবে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাদের চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করলে তারা যথারীতি নিযুক্ত হবেন।

মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারিগণ

জাতীয় স্বার্থে তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণকারী বেশ কিছুসংখ্যক কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চপদে পদোন্নীত করে পুরস্কৃত করেন এবং যেখানে পদোন্নয়নের সম্ভাবনা ছিলনা। সেখানে তাদেরকে পরবর্তী অগ্রিম পর্যায়ে বেতন দেন।

বৃত্তির স্কীম

'ডি' শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৃত্তিদানের স্কীম গ্রহণ করেন। শিক্ষার ব্যায়-ভার বেড়েছে বলে ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ব্যাংক বর্ধিত হারের বৃত্তি ঘোষণা করে।

কার্যালয় এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা

ঢাকায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় স্থাপন এবং সকল বিভাগের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে অতিরিক্ত স্থান-সংস্থানের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তথাপি, ইতিপূর্বে ব্যাংক-সংলগ্ন যে বহু-তল বিশিষ্ট দালান নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল তা নির্মাণ-সামগ্রীর মারাত্মক অভাবের দরুন বিশেষ অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাংক ৯-ই, মতিঝিল ঢাকার চতুর্থ তলাটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে ভাড়া নেয়।

নির্মাণ-সামগ্রীর অভাবের জন্যই বগুড়া ও সিলেটের কার্যালয়-দালানগুলি এবং গত বছর বগুড়া ও ঢাকায় কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণের যে প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচী অনুযায়ী হাতে নেওয়া হয়েছিল তাও সমাপ্ত হয়নি।

ব্যাংক ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও তদারকী করবার জন্য ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাংকিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিভাগের প্রচেষ্টায় সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সহায়তা-পুষ্ট "বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট" নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১লা জুন থেকে এর কাজ শুরু হয়। বর্তমানে এই ইনষ্টিটিউট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের শিক্ষানবিশ অফিসারদের জন্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম পরিচালনা করছেন। অফিসার ব্যাচে ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। যথাসময়ে অন্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম ও সেমিনারের আয়োজন করবার ব্যাপারে ইনষ্টিটিউটের উচ্চাশাসম্পন্ন পরিকল্পনা আছে।

১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে বোম্বেস্থ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ ব্যাংক মানেজমেন্ট এক প্রশিক্ষক (Trainers') শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের আয়োজন করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে ১২ জন অফিসারকে ভারতে পাঠানো হয় এতে অংশ নেওয়ার জন্য। এদের মধ্যে ৮ জন অফিসারকে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব্ ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের অনুষদ সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই ১২ জন অফিসার ছাড়া, বিভিন্ন ব্যাংকের অপর ৪ জন অফিসার ১৯৭৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচীর অধীনে ব্যাংক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অংশ নেন।

দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে দক্ষতা বাড়াবার জন্য ব্যাংকিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ বন্ধুদেশগুলির প্রযুক্তিমূলক সহায়তা প্রোগ্রামের অধীনে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাংক অফিসার পাঠাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাংক নোট

বাংলাদেশে তৃতীয় বারের মত ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়, যথাক্রমে ১৯৭৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ও ১৫ই অক্টোবর।

নিরাপত্তা-সুতো এবং জলছাপযুক্ত এই নোটের উপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতি অঙ্কিত রয়েছে। অতি-উচ্চমানের ব্যাংক নোট কাগজে এইগুলি ছাপা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের ১ টাকা নোট

ক) নিরাপত্তা-সুতো ও জলছাপযুক্ত উচ্চমানের ব্যাংক নোট কাগজে ছাপা ১ টাকার নোট তৃতীয়বারের মত ছাড়া হয় ১৯৭৩ সনের ১৮ই ডিসেম্বর।

খ) দেশের জরুরী চাহিদা মিটাবার জন্য প্রথমবারের মত ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ জলছাপহীন এবং বাংলাদেশের মানচিত্রের নক্শাসহ যে ১ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয় সেগুলি ১৯৭৪ সালের ৩০শে মার্চ তারিখ থেকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত এসব নোটের বিনিময়মূল্য দেওয়া হয়।

মুদ্রা

স্বাধীনতার সময় নিকেলের কাঁচা টাকাসহ যে সব পাকিস্তানী মুদ্রা বাজারে চালু ছিল তা মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৯৭৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের নতুন ৫ পয়সা, ১০ পয়সা এবং ১৯৭৩ সনের ১৫ই নভেম্বর থেকে ২৫ পয়সার নূতন মুদ্রা চালু করা হয়।

এই সকল মানের মুদ্রার এক পিঠে রয়েছে জাতীয় প্রতীকসহ কিঞ্চিৎ উন্নত বেড়।

৫ পয়সা মুদ্রার উল্টোদিকে রয়েছে মাঝখানের লাঙ্গলসহ কিঞ্চিৎ উঁচু একটি বেড়। লাঙ্গলের চার পাশে রয়েছে ৩২টি খাঁজ-কাটা দাগ-বিশিষ্ট চাকা। দশ পয়সার মুদ্রার অপর পিঠে রয়েছে মাঝখানের লম্বাকৃতি বোঁটাসহ পানের পাতা এবং তার চারদিকে রয়েছে একটি বেড়। ২৫ পয়সার উল্টোদিকে রয়েছে অলংকৃত নকশা এবং তার মাঝখানে ইলিশ মাছের নকশা।

১৯৭৩ সনের ৩০শে জুন তারিখে যেখানে এইসব দশমিক মুদ্রার মোট পরিমাণ ছিল ৫·৬০ কোটি টাকা সেখানে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭·৩৩ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে চালু ২০·৩১ কোটি টাকার মত টাকামুদ্রা/নোটের অতিরিক্ত এই মুদ্রা বাজারে চালু থাকে।

ইস্যু বিভাগ

১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন অনুযায়ী ইস্যু বিভাগের ব্যালেন্স শীট দেওয়া হলো। এটি বিবরণীর ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখা যাবে। এই তারিখে মোট ইস্যুকৃত নোটের পরিমাণ ছিল ৩২৫·৮৩ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের অনুরূপ তারিখে এর পরিমাণ ছিল ২৮৫·২৬ কোটি টাকা। ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে ৬০ কোটি টাকার মত অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা ছিল, ১০·৮৭ কোটি টাকার মুদ্রা ছিল, ২৪০·৬১ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের নিশ্চয়তাপত্র ছিল ও ১৪·৩৫ কোটির টাকার

আভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্র ছিল। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা ছিল ৬০'০০ কোটি টাকা, টাকা মুদ্রা ১২'৮৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের নিশ্চয়তা পত্র ২১২'৪১ কোটি টাকা।

ব্যাংকিং বিভাগ

১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখানুযী ব্যাংকিং বিভাগের একটি ব্যালেন্স শীট দেওয়া হচ্ছে ৩৪ পৃষ্ঠায়। দায়ের খাতে গত বছরের মতই সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব ৩ কোটি টাকা থেকে যায়। 'বার্ষিক হিসাব' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সংবিধিবদ্ধ তহবিলে (statutory fund) টাকা প্রদান করার জন্য ৩ কোটি টাকা তুলতে হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে যেখানে ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৯'৪৮ কোটি টাকা সেখানে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনে আমানতের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৯১'১৭ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (IBRD) ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাবগুলিসহ ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে অন্যান্য আমানতের' মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯১'০৫ কোটি টাকা। গত বছর এর হিসাব ছিল ১৩৯'২৪ কোটি টাকা। 'অন্যান্য আমানত' বৃদ্ধির মূল কারণ এই যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রথম ঋণ-সীমার মধ্যে টাকামুদ্রার একটা অংশ ছিল।

সম্পদ খাতে দেখা যায় ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনে বাংলাদেশের বাইরে আমানত ছিল ৩৩'৩৬ কোটি। অথচ, ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৫৯'১৬ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে সরকারকে প্রদত্ত আগাম ও ঋণের পরিমাণ ছিল গত বছরের মতই ২০ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন 'সরকারী ডেটর ব্যালেন্স' ছিল ৯'৫০ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে এর পরিমাণ ছিল ১০'৫০ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে 'অন্যান্য ঋণ ও আগাম' খাতে ব্যালেন্স ছিল ৫৪'৫৩ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৪৯.৭৯ কোটি টাকা। ব্যাংকের লগ্নি ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুনে ছিল ৫৩'৯৮ কোটি টাকা এবং ১৯৭৪ সালের ৩০ জুন এর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩০'৪৪ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধির কারণ প্রধানতঃ ছুটি অস্থায়ী ট্রেজারী বিলের উপর লগ্নি এবং বাংলাদেশ পাট শিল্প সংস্থা থেকে ঋণ-পত্র ক্রয়।

বার্ষিক হিসাব

১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের লাভ-ক্ষতির হিসাব ও ব্যালেন্স শীট দেয়া হয়েছে ৩৬ পৃষ্ঠায়। ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময়ে লাভ-ক্ষতির সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নরূপ :

মোট আয়		টাঃ ১৭,২৪,০৭,৮৮৬
মোট ব্যয়		টাঃ ৬,১০,৪৬,৭৬৯
	মুনাফা :	টাঃ ১১,১৩,৬১,১১৭

মোট লাভ ১১,১৩,৬১,১১৭ টাকার মধ্যে সরকারকে ৮,১৩,৬১,১১৭ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। বাকিটা নিম্নোক্ত আইনসম্মত তহবিল গঠনে লাগানো হবে :

(১)	গ্রামীন ঋণ তহবিল	টাঃ ৭৫,০০,০০০
(২)	কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	টাঃ ৭৫,০০,০০০
(৩)	শিল্প ঋণ তহবিল	টাঃ ৭৫,০০,০০০
(৪)	রপ্তানী ঋণ তহবিল	টাঃ ৭৫,০০,০০০
	মোট :	টাঃ ৩,০০,০০,০০০

নিরীক্ষক নিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এর ৬৫(১) ধারা অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষণ করে দেখবার জন্য বাংলাদেশ সরকার মেসার্স এস, এফ, আহমেদ এণ্ড কোম্পানী ও মেসার্স রহমান, রহমান হক এণ্ড কোম্পানী নামক দুটো চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্মকে নিয়োগ করেন।

সর্বশেষ

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরে ব্যাংকের কর্মচারী ও অফিসারগণ পরম নিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যালেন্স শীট এবং লাভ–ক্ষতির হিসাব

১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখানুযায়ী

ইস্যু বিভাগ

ব্যালেন্স শীট—৩০শে জুন, ১৯৭৪

দায়সমূহ	টাকা	টাকা	সম্পদসমূহ	টাকা	টাকা
ব্যাংকিং বিভাগে জমাকৃত নোট	১,২৫,২৭,৮৩০		১ ক) স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড	—	
			রৌপ্য	—	
			আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে এস ডি আর	—	
বাজারে চালু নোট *	৩২৪,৫৭,৪৮,০৪০		অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা	৬০,০০,০০,০০০	
			খ) টাকা মুদ্রা	১০,৮৬,৩৯,৪৬৯	৬০,০০,০০,০০০
মোট ইস্যুকৃত নোট		৩২৫,৮২,৭৫,৮৭০	বাংলাদেশ সরকারের নিশ্চয়তাপত্র**	২৪০,৬১,৩৬,৪০১	
			আভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যপত্র	১৪,৩৫,০০,০০০	
					২৬৫,৮২,৭৫,৮৭০
মোট দায়	টাকা	৩২৫,৮২,৭৫,৮৭০	মোট সম্পদ	টাকা	৩২৫,৮২,৭৫,৮৭০

* এখানে উল্লেখিত বাজারে চালু নোটের পরিমাণের সাথে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান/পাকিস্তান সরকারের, কাছে বাংলাদেশ ব্যাংক/বাংলাদেশ সরকার, বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অনুরূপ নোটের যে ক্ষতিপূরণ ও মূল্য চাইবে তার কোন সম্পর্ক নেই।

** পাকিস্তানী নোটের বদলে বাংলাদেশের নোট চালু করার বিপরীতে সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিল।

ব্যাংকিং বিভাগ

ব্যালেন্স শীট—৩০শে জুন, ১৯৭৪

দায়সমূহ	টাকা	সম্পদসমূহ	টাকা
পরিশোধিত মূলধন ...	৩,০০,০০,০০০	নোট সমূহ ...	১,২৫,২৭,৮৬০
সংরক্ষিত তহবিল ...	৩,০০,০০,০০০	টাকা-মুদ্রা ...	২,০০,৩৪৩
গ্রামীণ ঋণ তহবিল ...	১,৫০,০০,০০০	সহকারী মুদ্রা ...	১,৭৯,০৪৪
শিল্প ঋণ তহবিল ...	২,২৫,০০,০০০	ক্রীত ও বাটাকৃত বিলসমূহ :	
রপ্তানী ঋণ তহবিল ...	২,২৫,০০,০০০	(ক) আভ্যন্তরীণ ...	৪১,০৯,৩১,৫০৭
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ		(খ) বৈদেশিক ...	৩,৭৯,৮৯,৪৬৮
তহবিল ...	১,২৫,০০,০০০	(গ) সরকারী ট্রেজারী বিল...	৯৯,৩১,১৫০
		বাংলাদেশের বাইরে ব্যালেন্স*...	৩৩,৩৫,৯১,৪০৬
আমানত :		আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে এস ডি আর ...	—
(ক) সরকার ...	—	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও	
(খ) ব্যাংক ...	৯১,১৭,১৮,০৪৩	আগাম ...	২০,০০,০০,০০০
(গ) অন্যান্য ...	১৯১,০৫,০১,২০৯	সরকারী ডেটর ব্যালেন্স ...	৯,৫০,২০,৭৭৮
এস ডি আর-এর বরাদ্দ	—	অন্যান্য ঋণ ও আগাম ...	৫৪,৫৩,১১,৮৫০
দেয় বিল ...	১৬,৭৬,০৪৯	লগ্নি ...	১৩০,৪৩,৬৭,৫৮৫
অন্যান্য দায় ...	৭,১৭,৮৬,০৮৩	অন্যান্য সম্পদ ...	৭,৮১,৩০,৪২৩
মোট দায় ...	৩০২,৮১,৮১,৩৮৪	মোট সম্পদ ...	৩০২,৮১,৮১,৩৮৪

* এর মধ্যে রয়েছে নগদ ও স্বল্প মেয়াদী নিশ্চয়তাপত্রগুলো।

হিসাব নিরীক্ষকদের বিবরণী

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে,

আমরা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নস্বাক্ষরকারী হিসাব নিরীক্ষকগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে তৈরী ব্যালেন্স শীট ও হিসাবের বিবরণ দিচ্ছি।

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াস্থ শাখা কার্যালয়সমূহের হিসাব, সার্টিফিকেট ও ভাউচারসহ ব্যালেন্স শীট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। এই সমস্ত হিসাব, সার্টিফিকেট ও ভাউচারসমূহ যথারীতি সিলেট ও রাজশাহীস্থ সহকারী নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পরিবেশিত ও শংসিত। এইগুলো ব্যালেন্স শীটে দেয়া আছে। এখানে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা যেখানে ও যখনি কোন ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি চেয়েছি, তখনই তা পেয়েছি। প্রাপ্ত ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি সন্তোষজনক। আমাদের মতে ব্যালেন্স শীট আইনসম্মত ও সত্য। সত্যিকার অবস্থা জানার উপযোগী সমস্ত খবর ও তথ্যাদিসহ ব্যালেন্স শীট তৈরী করা হয়েছে। আমরা যা তথ্যাদি পেয়েছি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের বইতে যা দেখানো হয়েছে, আমাদের বিবরণী এরই উপর ভিত্তি করা।

ঢাকা,
২৯শে আগষ্ট,
১৯৭৪

রহমান, রহমান, হক এণ্ড
কোম্পানী,
চার্টার্ড একাউন্টেন্ট

এস, এফ আহমেদ এণ্ড
কোম্পানী,
চার্টার্ড একাউন্টেন্ট

লাভ-ক্ষতির হিসাব

বৎসরান্ত ৩০শে জুন, ১৯৭৪

আয়

সুদ, বাটা, বিনিময়, কমিশন ইত্যাদি : টাকা ১৭,২৪,০৭,৮৮৬

খরচ

প্রাতিষ্ঠানিক	...	...	টাকা	২,১৬,৮৭,২৩৮
পরিচালকদের ফি ও খরচ	...	...	,,	—
নিরীক্ষকদের ফি	...	...	,,	১০,০০০
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ	...	...	,,	১৭,৪১,৮১৬
আইন খরচ	...	...	,,	১৯,৩২৫
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ খরচ	...	...	,,	২,০৩,৭৩৫
নগদ টাকা প্রেরণ	...	...	,,	৬,৭৬,১৮৮
স্টেশনারী ইত্যাদি	...	...	,,	৯,০১,৯২২
নিরাপত্তা প্রিন্টিং (চেক্, নোট, ফরম ইত্যাদি)	...	...	,,	১,৯৫,৮০,৬৭৯
সম্পত্তি অবক্ষয় ও মেরামতি	...	...	,,	২৬,৯৩,০৬০
এজেন্সী খরচ	...	...	,,	১৭,৮৬,০৭৮
কর্মচারীদের প্রতি অনুদান	...	...	,,	—
বিবিধ খরচ	...	...	,,	১,১৭,৪৬,৭২৮
নীট ব্যালেন্স	...	...	,,	১১,১৩,৬১,১১৭
			মোট : টাকা	১৭,২৪,০৭,৮৮৬
সংরক্ষিত তহবিলে হস্তান্তর	...	...	,,	—
গ্রামীণ ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	...	...	,,	৭৫,০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	...	...	,,	৭৫,০০,০০০
রপ্তানী ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	...	...	,,	৭৫,০০,০০০
কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিলে হস্তান্তর		...	,,	৭৫,০০,০০০
সরকারকে প্রদত্ত উদ্বৃত্ত	...	...	,,	৮,১৩,৬১,১১৭
ব্যালেন্স	...	...	,,	—
			মোট : টাকা	১১,১৩,৬১,১১৭

সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব

৩০শে জুন, ১৯৭৩-এর ব্যালেন্স	...	...	টাকা	৩,০০,০০,০০০
লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে আনীত	...	...	টাকা	—
			মোটঃ টাকা	৩,০০,০০,০০০

এল, কিউ, চৌধুরী	এ, এইচ, চৌধুরী	কে, এ, রশীদ	আ, ন, হামিদুল্লাহ
হিসাব পরিচালক	কার্যকরী পরিচালক	সহকারী গভর্নর	গভর্নর

তপশিলী ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকার হিসাবে)

বিবরণসমূহ	নিম্নলিখিত তারিখে টাকার পরিমাণ	
	২৯-৬-১৯৭৩	২৮-৬-১৯৭৪
তলবী দায়সমূহ	৪০৯'৬০	৪৮৫'৬৪
দীর্ঘ-মেয়াদী দায়সমূহ	২৯৩'০৮	৩৯৯.৭৫
মোট :	৭০২'৬৮	৮৮৫'৩৯
বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ	৪৬'৮৫	৯৪'৭৪
নগদ অর্থ	১৮'৯৬	২১'১৪
বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ	৬৫'৮৪	৬৬'৬৭
বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাবে আমানত	৯'৪৬	৯'৪৬
বাংলাদেশে স্বল্প-নোটিশ ও তলবী অর্থ	২১'৭২	২১'০৯
বাংলাদেশে বিনিয়োগ	১৪৫'৯৬	১৮৫'৭৭
বাংলাদেশে মোট আগাম-ঋণ	৫৫৪'২৫	৭১৪'৯৬
বাংলাদেশে ক্রীত ও বাটাকৃত আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বিল	৫৮'৩০	১০১'৯৭

তপশিল ব্যাংকসমূহের তালিকা

(১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখানুযায়ী)

ক। জাতীয় ব্যাংকসমূহ :

(৵.) বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ

১) সোনালী ব্যাংক

২) রূপালী ব্যাংক

৩) অগ্রণী ব্যাংক

৪) জনতা ব্যাংক

৫) পূবালী ব্যাংক

৬) উত্তরা ব্যাংক

(৶.) বিশেষায়িত ব্যাংক

১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

খ। ভারতীয় ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য বিদেশী ব্যাংক :

১) গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংক

২) চার্টার্ড ব্যাংক

৩) অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যাংকিং কর্পোরেশন

গ। ভারতীয় ব্যাংক * (কার্যরত নয়) :

১) ব্যাংক অব্ বরোদা

২) সেন্ট্রাল ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

৩) ষ্টেট ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া

৪) ইউনাইটেড ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া

৫) ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাংক লিঃ

---

* ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে সহকারী তত্ত্বাবধায়কের ব্যবস্থাপনায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক
গ্রন্থাগার

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	প্যারা	লাইন	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১	২	১২	৬৭ লক্ষ টন	৬৬·৯৯ লক্ষ টন
১	২	১৪	১১৭·২২ লক্ষ টন	১১৭.২১ লক্ষ টন
৩	২	৩	১১৭·২২ লক্ষ টন	১১৭·২১ লক্ষ টন
৪	৪	২	৫২·৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড	৫২·৯২ মিলিয়ন পাউণ্ড
৫	২	২	৫০·৭৭ মিলিয়ন পাউণ্ড	৫০·৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড
৬	১	৮	৮৮,০০০ টন	৮৮,৫৬৬ টন
২২	১	৬	১৭ কোটি	১৭.১ কোটি
২২	৪	৩	১·৩ কোটি	১১·৩ কোটি
২৭	২	৪	৮০	১৮০
৩৭	১	১	লবী	তলবী

বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রেসিডেন্সী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ডি, পি, আর এণ্ড পি—৭৫—১৩০০

BANGLADESH BANK
Library
Head Office, Dacca

বার্ষিক রিপোর্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক

১৯৭৪–৭৫

BANGLADESH BANK
Library
Head Office, Dacca

প্রেরণ পত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা :
২৭শে আগষ্ট, ১৯৭৫

সচিব,
অর্থ মন্ত্রনালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

জনাব,

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ৪০ নং ধারার (২) নং উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুত ব্যাংকের ১৯৭৫ সালের জুন মাসে সমাপ্ত অর্থ বৎসরের বার্ষিক রিপোর্ট ও নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে উপস্থাপন করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত,

এ, কে, এন, আহ্মদ
গভর্ণর

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতিধারা	১
প্রধান খাত সমূহের অগ্রগতি	৪
কৃষিজাত উৎপাদন	৫
শিল্প উৎপাদন	৫
খাদ্য পরিস্থিতি	৬
মূল্য পরিস্থিতি	৭
জীবন যাত্রার ব্যয়	৭
অর্থ সরবরাহ ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিকাশ	৭
অর্থ সরবরাহ	৭
ব্যাংক কারবার ও ঋণ	৯
ব্যাংক হার	১০
আইনানুগ অর্থ মওজুদ	১০
লিকুইডিটি অনুপাত	১০
সুদের হার	১০
ঋণ নীতি ও নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ সমূহ	১১
ব্যাংক সুবিধাদি ও অর্থ সংস্থানে অগ্রগতি	১৩
শাখা বিস্তার	১৩
বৈদেশিক ব্যাংক কারবার	১৩
পাটের জন্য অর্থ যোগান	১৩
চায়ে অর্থ যোগান	১৩
পাল্টা অর্থ সংস্থান সুবিধাদি	১৩
কৃষিতে অর্থ সংস্থান	১৪
সরকারী রাজস্ব ও অর্থ সংস্থান	১৫
১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেট	১৫
১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট	১৬
সরকারের ঋণ	১৮

সরকারী সিকিউরিটি ১৮
সেভিংস সার্টিফিকেট/সঞ্চয় পত্র ১৮
প্রাইজ বণ্ড ১৮

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং লেনদেনের ভারসাম্য ... ১৯

বাণিজ্য নীতি ১৯

রপ্তানী লক্ষ মাত্রা ১৯
আমদানী নীতি ২০

রপ্তানী পণ্যের গতিধারা ২০

পাট, পাট জাত দ্রব্য ২১
চা ২২
পশুচর্ম ও চামড়া ২২

বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রনে অগ্রগতি ২৩

বিনিময় হার ২৩
বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রন ২৩

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন ২৩

কারেন্সী নোট ও মুদ্রা ব্যবস্থা ২৩

একশত টাকার নোট অচলিকরণ ২৩
মুদ্রা ২৪

প্রশাসন ২৪

নিয়োগ ২৪
চাকুরীর শর্তাবলীর উন্নয়ন ২৪
বাংলা ভাষায় অফিসের কাজ ২৪

ব্যালেন্স শীট ২৪

ইস্যু বিভাগ ২৪
ব্যাংকিং বিভাগ ২৫

বার্ষিক হিসাব ২৫

নিরীক্ষক নিয়োগ ২৬

অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতিধারা

১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকগুলি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। দেশের জন্য সমস্যাসমূহ বিরাট চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিকূল অবস্থা দূর করিয়া অর্থনীতিকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

২। স্বাধীনতালগ্ন হইতে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৎসরের প্রথমার্ধে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট এবং উন্নত দেশসমূহে প্রধানতঃ তৈলের মূল্যবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইহার ফলে টাকার মূল্যমান আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায় এবং দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্য ও জীবন যাত্রার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বৎসরের প্রথম দিকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির প্রধান কারণগুলি ছিল অত্যধিক হারে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রতুলতার দরুন আমদানী হ্রাস, বন্যার ফলে সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি, অনুৎপাদনমূলক কাজে ব্যাংক ঋণের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য এবং তৈলের মূল্যবৃদ্ধি। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, মুদ্রাস্ফীতিজনিত মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় দেশে ব্যাংক ঋণের একটা অংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য মওজুদের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। অনুৎপাদন খাতে এবং ফটকাব্যবসায়ে ব্যাংক ঋণের ব্যবহার বন্ধ করিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকহারে ঋণ যোগানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে পর্যায়ক্রমে কতিপয় বিশেষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া, একই উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে ব্যাংকের সুদের হার বর্ধিত করা হইয়াছিল। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, স্বাধীনতাকাল হইতে উল্লেখিত সময় পর্যন্ত ব্যাংকের সুদের হার অপরিবর্তিত ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ব্যাংক ঋণ এবং অর্থ সরবরাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী-মার্চ শেষে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৫৪˙৪৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৯০৮˙৪৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, উক্ত সময়ে অর্থ সরবরাহ ৪৮˙১৩ কোটি টাকা হ্রাস পায়।

৩। সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশের অর্থনীতিতে একটা সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে ১০০ টাকার নোট অচল ঘোষণা করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৫ সালের মে মাসে টাকার মূল্যমান পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। যেসকল কারণের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয় তাহা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

৪। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, সরকারকে প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি অর্থ সংস্থান করিতে হয়। জরুরী ত্রাণ, পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা এই ঘাটতি অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে মন্দাভাব বিরাজমান থাকায়, কর এবং শুল্কারোপ করিয়া স্বল্প পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া, যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি, শ্রমিক অসন্তোষ

সুদক্ষ পরিচালনার অভাব, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অপর্যাপ্ত সরবরাহ এবং আমদানীকৃত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের অভাবে রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্পসমূহ পূর্ণ উৎপাদনে ব্যর্থ হয় এবং বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাংকসমূহ কার্যকরী মূলধন ছাড়াও ক্ষতি পোষানোর নিমিত্তে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রচুর অর্থ সরবরাহ করিতে বাধ্য হয়। ফলে অর্থনীতিতে, মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি না করিয়া যে পরিমান অর্থ প্রচলন সম্ভব তাহার অধিক সরবরাহ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। অন্যদিকে, অনিবার্য কারণে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পায়। উৎপাদনের তুলনায় অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দ্রব্যমূল্যে অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। পরিসংখ্যান অনুসারে, স্বাধীনতার পর হইতে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩০০ ভাগ। এই মূল্য পরিস্থিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের, বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণী এবং সীমিত আয়ের লোকদের জন্য যে অসহনীয় ভোগান্তির সৃষ্টি করে তাহা সহজে অনুমেয়।

৫। অত্যধিক অর্থ সরবরাহ এবং মূল্য ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে অর্থনীতিতে অতিরিক্ত নগদ অর্থের (লিকুইডিটির) পরিমান যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অতিরিক্ত লিকুইডিটি দূর করার উদ্দেশ্যে কোন সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা চালান হয় নাই। ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ অব্যাহত থাকে। কাজেই শতকী নোট অচলনের পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে একটি "ওপেন মার্কেট অপারেশন" জাতীয় সরাসরি মুদ্রা সংকোচন ব্যবস্থা। অন্যদিকে, জনসাধারণের জন্য ইহা ছিল বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের একটি উপায়। কোন প্রকারে অর্থ বাজেয়াপ্ত করা এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং অর্থনীতির স্বার্থে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা সীমিত করাই ছিল এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। অর্থনীতির উপর হইতে মওজুদদারী এবং কালোবাজারীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত "কালো টাকার" প্রভাব দূর করাও এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দ্রব্য মূল্য, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্য কিছুটা হ্রাস পায়।

৬। দেশে ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ফলে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের দেশীয় ব্যয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যের মধ্যে বিরাট অসমতার সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশের টাকার ক্রয় ক্ষমতা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। সরকারী বিনিময়হারের তুলনায় খোলা বাজারে টাকার মূল্যমানের অত্যধিক অবনতি হইতেই ইহা সুস্পষ্ট হয়। ইহার ফলে, একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর চোরাচালান লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়, তেমনি অন্যদিকে দেশের প্রধান রপ্তানীযোগ্য পণ্যের রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পাটের তুলনায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পাট চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ১৯৭৪-৭৫ সালে দেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য পাটের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং আভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। এমন কি, পাটের বর্ধিতহার রপ্তানী মূল্যও রপ্তানী ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল বিবেচিত হয়। ইহা ছাড়া, কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সকল প্রকার পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের কৃত্রিম আঁশের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৭। দেশের প্রধান পণ্য সামগ্রীর রপ্তানী ত্বরান্বিত করার জন্য বিপুল পরিমাণ ভর্তুকী প্রদান অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। অপরদিকে, অধিক পরিমাণ ভর্তুকী প্রদানের ফলে সরকারের

রাজস্ব তহবিলের উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায়, ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আভ্যন্তরীণ সম্পদ সীমিত হওয়ায় ভর্তুকী প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকার ঘাটতি অর্থ সংস্থান করিতে বাধ্য হইবে, এবং সেইক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহ সীমিত রাখার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। অন্যদিকে, রপ্তানী বাণিজ্য বিঘ্নিত হইলে দেশে কৃষি এবং শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হইবে। বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতাহেতু কৃষি উপকরণ এবং শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আমদানীকৃত কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ সম্ভবপর হইবে না। এই জটিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার ১৯৭৫ সালের ১৭শে মে হইতে কার্যকর পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর সহিত বাংলাদেশ টাকার নূতন বিনিময় হার ৩০·০০ টাকায় নির্ধারণ করেন।

৮। টাকার মূল্যমান পুনঃনির্ধারণের ফলে কোন ভর্তুকী ছাড়াই দেশীয় পণ্য রপ্তানী করা সম্ভবপর হইবে। আশা করা যায়, রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে রপ্তানী-ভিত্তিক শিল্পের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। রপ্তানী-আয় বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা সম্প্রসারণের ফলে অধিকহারে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানী করা সম্ভব হইলে অন্যান্য শিল্পেও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। টাকার মূল্যমান পুনঃনির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উপর ভর্তুকীর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এবং আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ও বিক্রয় কর প্রভৃতি খাত হইতে প্রাপ্ত আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনার ফলে সার্বিক রাজস্ব পরিস্থিতির উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারের ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করা সম্ভব হইবে। অন্যদিকে, শিল্পোৎপাদন এবং আমদানী বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হইলে, দেশে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে টাকার মূল্যমান পুনঃনির্ধারণ এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য কতিপয় বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বৈদেশিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকার মূল্যমান পুনঃনির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশে অর্থ প্রেরণ প্রিমিয়াম প্রথা ও মুদ্রা বিনিময় কর প্রত্যাহার করা এবং ইহার মাধ্যমে বিনিময় হারের একীভূত প্রথার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

৯। টাকার মূল্যমান পুনঃনির্ধারণের ফলে যদিও কতিপয় ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তথাপি সরকারী সংস্থা সমূহে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন নীতি অনুসরণে যে মুনাফা অর্জিত হইবে তাহা উক্ত মূল্য বৃদ্ধিকে বহুলাংশে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইবে। বেসরকারী খাতেও বর্তমান অপূর্ণ চাহিদা উক্ত মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিতহারে আমদানীকৃত দ্রব্যমূল্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে না।

১০। অর্থ এবং ঋণদান ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনিয়ন্ত্রিত ব্যাংকঋণ সম্প্রসারণ ও সরকারের ঘাটতি অর্থ সংস্থান বৃদ্ধির উৎস এবং কারণ সমূহ নির্ণয়ের জন্য যথারীতি প্রচেষ্টা চালায়। তদানুসারে ঘাটতি অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে "কাউন্টারপার্ট ফান্ড" সমূহ যথাশীঘ্র সরকারী হিসাবে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইতিপূর্বে, এই সমস্ত অর্থ সময়মত সরকারী হিসাবে জমা প্রদানের পরিবর্তে বিভিন্ন সংস্থা নিজ নামে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত রাখিত। কাউন্টারপার্ট ফান্ডের এইরূপ ব্যবহার কেবল সরকারকেই তাহার নিজ আয় হইতে বঞ্চিত করিতনা, অধিকন্তু ইহার

ফলে ব্যাংক সমূহের আমানত ভিত্তি সম্প্রসারিত হইত এবং অধিক মাত্রায় ঋণ সৃষ্টি এবং সেই কারণে অর্থ সরবরাহের বিস্তৃতি ঘটাইত।

১১। ব্যাংক সমূহকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাহারা যেন বেশীর ভাগ ঋণ নিজ আমানত সম্পদ হইতেই দেয় এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হয়। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সফলতা লাভ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে প্রদত্ত "কাউন্টারফিনান্সের" (পাল্টা অর্থ যোগান) পরিমাণ হ্রাস হইতে ইহা প্রতীয়মান হয়।

১২। ব্যাংক সম্প্রতি দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাংকঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ নিশ্চিত করার প্রয়াস পায়। এই উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণের সর্বোচ্চ মাত্রা, অগ্রাধিকার ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পথ নির্দেশ করার নীতিমালা প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ব্যাংকসমূহের সহযোগীতায় ঋণের যথাযোগ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। পাটকল, চিনিকল, কাপড়ের কল, এবং চামড়ার কারখানা জাতীয় বৃহৎ ঋণ ব্যবহার-কারীদের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারক নীতি স্থাপনও করা হইয়াছে, যাহাতে এই সমস্ত ঋন ব্যবহারকারী সংস্থা যথাশীঘ্র ব্যাংক ঋণ ফেরৎ দিতে বাধ্য হয় ও ঋণের সাহায্যে অতিমাত্রায় মওজুত বৃদ্ধি না করিতে পারে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে তাহাদের অযোগ্যতাজনিত ব্যয় বহন করার সুযোগ না নিতে পারে।

১৩। সরকারী সংস্থা সমূহ যাহাতে চাপ প্রয়োগে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থাগ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সরকারী আয়ব্যয়ের দৈনন্দিন গতি ও ঘাটতি অর্থ সংস্থানের প্রকৃত পরিমাণের প্রতি নিয়মিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইতেছে যাহাতে বিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দিলে যথা সময়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়।

১৪। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এই কারণে কোন ত্বরিত ব্যবস্থায় দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভবপর নহে। মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থ সরবরাহ হ্রাস করিয়া হয়ত দ্রব্যমূল্য আয়ত্বে আনা যায়, তবে একমাত্র উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম ত্বরান্বিত করার মাধ্যমেই দারিদ্র দূর করা সম্ভব। পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল অতিমাত্রায় অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি। তবে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্য্যকরী ব্যবস্থাবলী আলোচ্য বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থ সরবরাহ, ব্যাংকঋণ, দ্রব্যমূল্য এবং জীবন ধারণের ব্যয়ের উপর তাৎপর্য্যপূর্ণ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। ইহা ছাড়া আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বৎসরান্তে দেশের অর্থনীতি পরিকল্পিত বৃদ্ধি ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্ত অধিকতর প্রস্তুত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রধান খাত সমূহের অগ্রগতি

১৫। প্রাথমিক হিসাব অনুসারে ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বৎসরে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা দুইভাগ, অথচ লক্ষ্য মাত্রা ছিল শতকরা ৫-৬ ভাগ। তুলনামূলকভাবে,

সালে বৃদ্ধির ১৯৭৩-৭৪ হার ছিল আনুমানিক ১২ শতাংশ। আলোচ্য বৎসরে এই সামান্য বৃদ্ধি আবাসিক ও সাধারণ নির্মাণকার্য্য, গণপ্রশাসন, ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায়, শক্তি ও গ্যাস এবং পেশাদারি চাকুরী ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়। প্রধান খাতগুলির মধ্যে, সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন শতকরা ২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে এবং বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনও দুই শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে।

কৃষিজাত উৎপাদন

১৬। মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ আসিয়া থাকে কৃষি খাত হইতে। এই খাতে, ধান উৎপাদন ১৯৭৩-৭৪ এর তুলনায় ৩˙৪৩ শতাংশ কমিয়া বর্তমান বৎসরে ১১৩˙১৯ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে আমন ফসলের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৬৬˙৯৯ লক্ষ টন। সেই তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ৭৩ লক্ষ টন লক্ষ্যমাত্রার স্থলে উৎপাদন ৬০ লক্ষ টনে নামিয়া আসে। আউস ফসলের উৎপাদন ২৮˙৫৯ লক্ষ টন পূর্ববর্তী বৎসরের ২৮˙০৩ লক্ষ টন হইতে সামান্য বেশী হইলেও ৩২ লক্ষ টনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা হইতে যথেষ্ট কম হয়। বোরো উৎপাদন সম্ভবতঃ ইহার লক্ষ্যমাত্রা ২৪˙৬০ লক্ষ টনে পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছে। আগের বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ২২˙২০ লক্ষ টন। পাটের ক্ষেত্রেও উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। পূর্ববর্তী বৎসরের ৬১˙৫০ লক্ষ বেলের স্থলে ১৯৭৪-৭৫ সালে মাত্র ৪০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়। একদিকে কম এলাকায় পাট চাষ ও অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ। আলু, তামাক এবং শাকসব্জির মত গৌণ ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। চায়ের উৎপাদন সর্ব-কালীন উৎপাদন মাত্রাকে ছাড়াইয়া ৭০৯˙২ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬১১˙০ লক্ষপাউণ্ড। আলোচ্য বৎসরে ইক্ষু এবং তামাক উৎপাদন ও যথাক্রমে ৬৬˙৩৫ লক্ষ টন এবং ৪১˙১০ হাজার টন পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পায়।

শিল্প উৎপাদন

১৭। মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ আসিয়া থাকে শিল্প খাত হইতে। ১৯৭৪-৭৫ সালে শিল্প উৎপাদনে ক্ষিপ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। বেশ কিছু সংখ্যক শিল্প যেমন, সুতি বস্ত্র, চিনি, দিয়াশলাই, সিমেন্ট, কাগজ ও নিউজপ্রিন্টের উৎপাদনের উন্নতি হয়। কিন্তু পাট শিল্প, ইস্পাত ও সুতা উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় হ্রাস পায়। রাসায়নিক সার উৎপাদনও বিশেষভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কাঁচামাল এবং যন্ত্রাংশের দুস্প্রাপ্যতা ছিল এই শিল্প উৎপাদন হ্রাসের মূল কারণ। বৎসরের প্রথমার্ধে এ দুস্প্রাপ্যতা ছিল সব চেয়ে প্রকট। ফলে. শিল্প খাতে সামগ্রিক উৎপাদন প্রত্যাশিত শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধির স্থলে প্রকৃতপক্ষে ১˙৩ শতাংশ হ্রাস পায়।

১৮। ১৯৭৪ এর জুলাই হইতে ১৯৭৫ এর মে অবধি সুতি বস্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়া ৭৭১˙৫১ লক্ষ গজে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসরের সমসাময়িক কালে ইহার পরিমাণ ছিল ৮১৭˙৫২ লক্ষ গজ। একই সময় দিয়াশলাই উৎপাদন ১˙৮১ লক্ষ গ্রোস বাক্স বাড়িয়া ৫৭˙৮৪ লক্ষ গ্রোস বাক্স হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ বৎসরের প্রথম ১১ মাসে সিমেন্ট উৎপাদন ০˙৪৩ লক্ষ টন হইতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরের ০˙৭৪ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে। চিনি উৎপাদন ০˙৮৮ লক্ষ টন হইতে ০˙৯৭ লক্ষ টনে বাড়িয়াছে। কাগজ এবং নিউজপ্রিন্টে উৎপাদনও ০˙৪৬ লক্ষ টন হইতে ০˙৫১ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রসায়ন উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের ০˙১৩ লক্ষ টনে প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

১৯। বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলশ্রুতি হিসাবে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন জুলাই, ১৯৭৪—জুন, ১৯৭৫ সময়ে ৪˙৪৪ লক্ষ টনে হ্রাস পায়। সেই স্থলে ১৯৭৩-৭৪

সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫'০০ লক্ষ টন। পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে, বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিরাজমান অর্থনৈতিক মন্দার ফলে নির্মাণ কার্যাবলী বিঘ্নিত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কার্পেট ব্যাকিং এর চাহিদা স্তিমিত হইয়া পড়ে। ফলে এই দ্রব্য উৎপাদনকারী পাটকল সমূহকে বন্ধ ঘোষণা করিতে হয়। সুতা উৎপাদন গত বৎসরের ৮১৮'৭৯ লক্ষ পাউণ্ডের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে সামান্য কমিয়া ৮১৫'৩০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ইস্পাত উৎপাদন ১'৯০ লক্ষ টন হইতে ১'৬৫ লক্ষ টনে নামিয়া আসে। রাসায়নিক সার উৎপাদন ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রথম ১১ মাসে ২'৬১ লক্ষ টনের স্তর হইতে ১৯৭৪-৭৫ সালের উক্ত সময়ে মাত্র ০'৬০ লক্ষ টনে হ্রাস পায়। ঘোড়াশাল সার কারখানায় বিস্ফোরণই ইহার কারণ।

২০। প্রধানতঃ বর্ধিত চাহিদার প্রতিকূলে চাউলের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলে ১৯৭৪-৭৫ সালের অধিকাংশ সময়ে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সংকটাপন্ন থাকে। চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য শস্যের মূল্য জুলাই, ১৯৭৪ হইতে মার্চ, ১৯৭৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অবশ্য, ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে আমন ফসল উঠিবার পর অল্প সময়ের জন্য কিঞ্চিৎ মূল্য প্রশমন ঘটে। বৎসরের শেষ চতুর্থাংশে খাদ্যের মূল্য চাপ কিছুটা লাঘব হয়।

খাদ্য পরিস্থিতি

২১। ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২০'০০ লক্ষ টন। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ইহার পরিমাণ ২'২০ লক্ষ টন বেশী। কিছু পরিমাণ মওজুদ রাখিবার ব্যবস্থাসহ এই বৎসর খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন নির্ধারণ করা হইয়াছিল ২৩'০০ লক্ষ টন। প্রকৃতপক্ষে, জুলাই, ১৯৭৪ হইতে জুন, ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে চাউল আমদানী করা হইয়াছে ২'৬০ লক্ষ টন এবং গম ২০'৩৬ লক্ষ টন, অর্থাৎ মোট খাদ্যশস্য ২২'৯৬ লক্ষ টন। তবে বৎসরের প্রথম তিন চতুর্থাংশে আমদানীকৃত খাদ্যশস্য পৌঁছাইয়াছে শ্লথ গতিতে মোট ১৪.০৯ লক্ষ টন মাত্র। শেষ চতুর্থাংশে (এপ্রিল-জুন, ১৯৭৫) আমদানী ত্বরান্বিত হইয়া ৮'৮৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায়।

২২। জুলাই, ১৯৭৪ হইতে মার্চ, ১৯৭৫ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল চোরাকারবার ও মওজুদ ব্যবসা, বন্যার কারণে আমন ফসলের ক্ষতি এবং স্বল্প আমদানীর ফলে চাউল সরবরাহে অপ্রতুলতা। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে সাধারণ চাউলের গড় বাজারদর মনপ্রতি ১৩০ টাকা হইতে ১০১% বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে ২৬৩ টাকায় উঠে। পরবর্তী সময়ে মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া জুন মাসের শেষে ১৯৯ টাকায় দাঁড়ায়। বৎসরের শেষ চার মাসে মূল্য হ্রাসের পরিমাণ ২৪ শতাংশ। এইরূপে মোটা চাউলের মূল্য সারা বৎসরে শতকরা ৫৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে, মাঝারী ধরনের চাউলের গড় বাজারদর ১৯৭৪ সালের জুন মাসে ১৫৩ টাকা হইতে ১৯৭৫ এর মার্চ মাসে ২৮৫ টাকায় বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৮৬ ভাগ। এপ্রিল-জুন, ১৯৭৫ সময়কালে মাঝারী চাউলের মূল্য ১৯ শতাংশ হ্রাস পাইয়া জুন মাসের শেষ দিকে ২৩১ টাকায় দাঁড়ায়। এই হিসাবে মাঝারী চাউলের মূল্যও সারা বৎসরে শতকরা ৫১ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

২৩। প্রায় সারা বৎসর দেশে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি সংকটাপন্ন থাকে। বিরূপ মূল্য পরিস্থিতি পণ্যাদির সরবরাহে অপ্রতুলতা, এবং বিশেষতঃ চাউলের ঘাটতি সরবরাহ প্রতিফলিত করে। বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করিয়া শেষ চতুর্থাংশে, মূল্য বৃদ্ধি কিছু পরিমাণে প্রশমিত হয়।

মূল্য পরিস্থিতি

কয়েকটি প্রয়োজনীয় পণ্যের, যথা খাদ্যশস্য এবং মোটা কাপড়ের মূল্য নিম্নগামী হয়। মুদ্রাস্ফীতির চাপ সংযত করিবার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহের ফলশ্রুতি হিসাবে এই মূল্য হ্রাস ঘটে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলি হইতেছে, মওজুদদারী ও ফটকা ব্যবসা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ১০০-টাকার নোট অচল ঘোষণা, আন্তঃজেলা খাদ্যশস্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার সুতিবস্ত্র ও সুতা বন্টন নিয়ন্ত্রণ প্রথা শিথিলকরণ, এবং চোরাকারবারী, মওজুদদারী ও কালোবাজারী নিয়ন্ত্রনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

জীবন যাত্রার ব্যয়

২৪। সারা বৎসরে ঢাকা শহরে মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীদের জীবন যাত্রা ব্যয় সূচক* (১৯৬৯-৭০=১০০) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সূচক ১৯৭৪ সালের জুন মাসে ৩০৫'৭১ হইতে ১৯৭৫ এর জানুয়ারী মাসে ৪৫৮'৫১ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য, যথা চাউল, গম, সরিষার তৈল, চিনি, কেরোসিন তৈল, লবন, মাংস এবং ডালের পর্যায় ক্রমিক মূল্য বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। পরবর্তী সময়ে ক্রমশঃ ব্যয় সূচক হ্রাস পাইয়া ১৯৭৫ এর জুন শেষে ৪০৯'৬৬ তে দাঁড়ায়। এইরূপে, সারা বৎসরে জীবন ধারণের ব্যয় সূচকের বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩৪ ভাগ। তুলনামূলক ভাবে, ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বৎসরে ইহার বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ৪৪ ভাগ। "খাদ্য" অনুসূচী জুন, ১৯৭৪ হইতে জুন, ১৯৭৫ পর্যন্ত ৩২৬'৫৭ হইতে ৪৪০'৯২ অর্থাৎ ৩৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। "জ্বালানি ও আলোকায়ন", "পোষাক ও পাদুকা", "বাসস্থান ও গৃহস্থালি" এবং "বিবিধ" অনুসূচীগুলি যথাক্রমে ৩৪%, ৮%, ৯০% এবং ৩০% বৃদ্ধি পায়।

২৫। নারায়ণগঞ্জের শিল্প শ্রমিকদের জীবন ধারণ ব্যয় সূচক* ও (১৯৬৯-৭০=১০০) সারা বৎসরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। "সাধারণ" সূচী জুন ১৯৭৪ এর ৩৫১'৬১ স্তর হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া জানুয়ারী, ১৯৭৫ এ ৫৩৬'৫৪ স্তরে উঠে, কিন্তু জানুয়ারীর পরবর্তী সময় হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৫ এর জুন মাস অবধি ৪৪৮'৬৯ এর স্তরে নামিয়া আসে। এই হিসাবে, সারা বৎসরে নিট বৃদ্ধির পরিমাণ ২৮ শতাংশ। এই বৃদ্ধিতে অংশ গ্রহন করে সমস্ত অনু-সূচী সমূহ। সমস্ত বৎসরে "খাদ্য দ্রব্যের" ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৩৩%, "বাসগৃহ ও গৃহস্থালি" ২৫%, "পরিচ্ছদ বস্ত্র এবং পাদুকা" ১% এবং "বিবিধ" ৩৪%।

অর্থ সরবরাহ ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিকাশ

অর্থ সরবরাহ

২৬। বৎসরের প্রথমার্ধে অর্থ সরবরাহ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উক্ত সময়ে ১২০'৯৮ কোটি টাকা (+১৪'৮%) বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে মোট অর্থ-সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩৭'৭৬ কোটি টাকা। অতঃপর বৎসরের শেষার্ধে দৃঢ় সংকোচনশীল আর্থিক ও ঋণ নীতি অনুসরণের ফলে অর্থ সরবরাহে ক্রমহ্রাস প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সময়-কালে গৃহীত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ সরবরাহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে ৮৮৯'৬১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৭৫ এর এপ্রিল মাসে একশত টাকার নোট অচল ঘোষণার ফলে অর্থ সরবরাহে বিশেষ সংকোচন ঘটে।

---

* উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অফ ষ্ট্যাটিসটিকস, ঢাকা।

ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৭৪-৭৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থ সরবরাহ ১২৩'২৩ কোটি টাকা (−১৩'২%) হ্রাস পায়। অতএব, সারা বৎসরে অর্থ সরবরাহ নেট ২'২৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯৭৫ সালের জুন মাস শেষে ৮১৪'৫৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, পূর্ববর্তী বৎসরে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১২০'৭৫ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭ ভাগ।

২৭। সরকারী খাতে আভ্যন্তরীণ ঋণের* পরিমাণ ১৩১'৮৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি না পাইলে ১৯৭৪-৭৫ সালে অর্থ সরবরাহ আরও অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইত। তদুপরি, দেশের আন্তর্জাতিক হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১১২'৬৬ কোটি টাকা এবং সরকারী রাজস্ব কার্যকলাপে ঘাটতি ১৬'৮৪ কোটি টাকা অর্থ সরবরাহকে স্ফীত করে। অবশ্য শতকী নোট অচলন ও অন্যান্য "বিবিধ" কারণে ১৮৫'৫৮ কোটি টাকা হ্রাস, সময় (মেয়াদী) আমানতে ৭৩'৪২ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত খাতে ৪'৬১ কোটি টাকা ঋণ সংকোচনের ফলে মোট অর্থ সরবরাহ হ্রাস সম্প্রসারণের অংককে অতিক্রম করে।

২৮। ১৯৭৪-৭৫ সালের অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনে বিভিন্ন কারণ সমূহের প্রভাব নিম্নে বর্ণিত হইল :—

অর্থ সরবরাহ* পরিবর্তনের কারণ সমূহ

প্রসারণ (+)
সংকোচন (−)
(কোটি টাকায়)

	২৮-৬-৭৪	২৭-৬-৭৫	পরিবর্তন
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	৩৩১'১৪	২৯৩'১২	−৩৮'০২
২। তলবী আমানত	৪৮৫'৬৪	৫২১'৪১	+৩৫'৭৭
অর্থ সরবরাহে পরিবর্তন			− ২'২৫
(ক) সমন্বিত আভ্যন্তরীণ ঋণ সংকোচন/প্রসারণ (১+২−৩)			+ ৫৩'৮৩
১) ব্যক্তিগত খাত			− ৪'৬১
২) সরকারী খাত			+ ১৩১'৮৬
(অ) সরকারী খাতে ঋণ			+ ৯০'৫৯
(আ) সরকারী খাতে বিনিয়োগ			+ ৪১'২৭
৩) তপশিলী ব্যাংক সমূহে মেয়াদী আমানত (আন্তঃ ব্যাংক বাদ দিয়া) (প্রসারণ−)			− ৭৩'৪২
(খ) সরকারী রাজস্ব কার্যক্রম			+ ১৬'৮৪
(গ) বৈদেশিক খাত			+ ১১২'৬৬
(ঘ) বিবিধ কারণ (অবশিষ্ট)			− ১৮৫'৫৮**
মোট কারণ সমূহ			− ২'২৫

* সাময়িক

** একশত টাকার নোট অচলিকরণ এবং টাকার বিনিময় মূল্য পুনর্নির্ধারণ, এই উভয়ের ফলাফল সহ।

২৯। মোট অর্থ সরবরাহের মধ্যে, ব্যাংকে বহির্ভূত মুদ্রা ৩৮'০২ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বৎসরান্তে ২৯৩'১২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, ব্যাংকে গচ্ছিত তলবী (চাহিদা) আমানত ৩৫'৭৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫২১'৪১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

৩০। অর্থ সরবরাহ এবং ইহার উপাদান সমূহের ত্রৈমাসিক পরিবর্তন নিম্নে নির্দেশিত হইল:

(কোটি টাকায়)

সময়	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	চাহিদা আমানত	অর্থ সরবরাহ	অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন
জুন, ১৯৭৪ সমাপনী	৩৩১'১৪	৪৮৫'৬৪	৮১৬'৭৮	—
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সমাপনী	৩৪৯'৮৫	৪৭১'২৯	৮২১'১৪	+ ৪'৩৬
ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সমাপনী	৪০২'৭৬	৫৩৫'০০	৯৩৭'৭৬	+ ১১৬'৬২
মার্চ, ১৯৭৫ সমাপনী	৩৯৫'১৬	৪৯৪'৪৭	৮৮৯'৬৩	− ৪৮'১৩
জুন, ১৯৭৫ সমাপনী	২৯৩'১২	৫২১'৪১	৮১৪'৫৩	− ৭৫'১০

৩১। তপশিলী ব্যাংক সমূহ প্রদত্ত অনাদায়ী ব্যাংক ঋণ* ১৯৭৪ সালের জুলাই হইতে ১৯৭৫ এর জুন অবধি ৫৩'৪৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৭০'৪১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২০৪'৩৮ কোটি টাকা। মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে, আগাম ঋণ ৬৬'৭০ কোটি টাকা বাড়িয়া ৭৮১'৬৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায় এবং ক্রীত ও বাটাকৃত বিলের পরিমাণ ১৩'২২ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৮৮'৭৫ কোটি টাকায় নামে।

ব্যাংক কারবার ও ঋণ

৩২। বিশদ বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সময়ে ব্যাংক ঋণ ৬৯'৪৯ কোটি টাকা বাড়িয়া ৮৮৬.৪২ কোটি টাকা হয়। অক্টোবর—ডিসেম্বরে বৃদ্ধির পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। এই সময়ে ৭৬.৪৬ কোটি টাকা বাড়িয়া মোট ঋণ ৯৬২.৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বৎসরের উক্ত সময়ে সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেন বেশী হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া অন্যান্য প্রসারণী শক্তি সমূহ এই বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। ফলে বৎসরের প্রথমার্ধে ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৫'৯৫ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধির অধিকাংশই ঘটে সরকারী খাতে। এই সময়ে কেবল মাত্র সরকারী খাতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিপরীতে ব্যাংক আগাম বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭০'৫৬ কোটি টাকা।

৩৩। অনুৎপাদন খাতে এবং ফটকা ব্যবসায়ে ব্যাংক ঋণের ব্যবহার বন্ধ করা এবং ব্যাংক ঋণের দ্রুত বৃদ্ধি রোধ করিয়া অর্থ সরবরাহ এবং মূল্য পরিস্থিতিকে সংযত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বরে অনেকগুলি বিশেষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই সমস্ত পদক্ষেপ ব্যাংক ঋণের ধারাকে সংহত করণে যথেষ্ট কার্যকরী হয়। ১৯৭৫ এর জানুয়ারী-মার্চে ব্যাংক ঋণ ৫৪'৪৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৯০৮'৪৩ কোটি টাকায় নামে। অনুরূপভাবে, বৎসরের শেষ চতুর্থাংশে মোট ঋণ আরও ৩৮'০২ কোটি টাকা সংকোচিত হইয়া

* আগাম + বিল (ক্রীত ও বাটাকৃত)

৮৭০'৪১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং ১৯৭৪-৭৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাংক ঋণ সংকোচনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২'৪৭ কোটি টাকা।

৩৪। ১৯৭৪-৭৫ সালে তপশিলী ব্যাংক সমূহের আমানত (আন্তঃব্যাংক বাদ দিয়া) ১০৯'১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯৪'৫৮ কোটি টাকা হয়, সেই স্থলে ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৮২'৭১ কোটি টাকা। মোট আমানতের মধ্যে, তলবী আমানত ৩৫'৭৭ কোটি বৃদ্ধি পাইয়া ৫২১'৪১ কোটি টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৭৩'৪২ কোটি টাকা বাড়িয়া ৪৭৩'১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে মেয়াদী আমানতে আনুপাতিক ভাবে অধিকতর বৃদ্ধি তলবী হইতে মেয়াদী আমানতে সঞ্চয়ের কিছুটা পরিবর্তন নির্দেশ করে। সম্ভবতঃ, ১৯৭৪ সালের জুলাই মাস হইতে সুদের হার পরিবর্তন ইহার কারণ।

৩৫। ১৯৭৪-৭৫ সালের প্রথমার্ধে ব্যাংক সমূহের "লিকুইডিটি" পরিস্থিতি সংকটাপন্ন থাকে। তাহাদের ঋণ আমানত অনুপাত জুলাই, ১৯৭৪ এ ০'৭৬ হইতে ডিসেম্বর, ১৯৭৪ এ ০'৮৬তে উন্নীত হয়। কিন্তু অর্থ বৎসরের সমাপনীতে জুন মাসে উহা ০'৭৪ এ নামিয়া আসে। বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে তপশিলী ব্যাংক সমূহের অনাদায়ী ধারের পরিমাণ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪ এ সর্বোচ্চ মাত্রা ১৮৭'৮১ কোটি টাকায় পৌঁছে। অবশ্য বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে ধারের পরিমাণ কমিয়া ১৯৭৫ এর জুনে ১১৫'৫৪ কোটি টাকায় নামে, এই মাত্রা ১৯৭৪ এর জুনের তুলনায় ২৩'৮০ কোটি টাকা বেশী। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট তপশিলী ব্যাংক সমূহের জমা এবং তাহাদের নিজ তহবিলে রক্ষিত নগদ অর্থ আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ১০'৬৭ কোটি ও ১'৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৭'৩৪ কোটি এবং ২২'৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

ব্যাংক হার

৩৬। ২১শে জুন, ১৯৭৪ হইতে ব্যাংক হারকে বাৎসরিক ৫% হইতে ৮% এ বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে এই বর্ধিত ব্যাংক হার অপরিবর্তিত থাকে।

আইনানুগ অর্থ মওজুদ

৩৭। আলোচ্য বৎসরে তপশিলী ব্যাংক সমূহের মোট তলবী এবং মেয়াদী দায়ের বিপরীতে আবশ্যিক ভাবে ৫% ভাগ নগদ অর্থ জমা রাখার প্রচলিত বিধি বলবৎ থাকে।

লিকুইডিটি' অনুপাত

৩৮। ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বৎসরে তপশিলী ব্যাংকের "লিকুইডিটির" অনুপাত তাহাদের মোট তলবী এবং মেয়াদী দায়ের ২৫% ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

সুদের হার

৩৯। ক্রম হ্রাসমান মুদ্রা-মূল্য এবং সামগ্রিক মূল্যস্তরের ধারাবাহিক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা উত্তরকালে অপরিবর্তিত সুদ-হার কাঠামোকে সংশোধন করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই কারণে, সুদেরহার কাঠামোকে যুক্তি সংগত করার উদ্দেশ্যে ২১শে জুন, ১৯৭৪ হইতে কার্যকরী ব্যাংক হারকে বাৎসরিক ৫% হইতে ৮% এ উন্নীত করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে আমানত এবং ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদের হারকে ১লা জুলাই, ১৯৭৫ হইতে বর্ধিত করা হয়। নুতন হার সমূহ পুর্বতন হার হইতে লক্ষ্যনীয়ভাবে বেশী। সাধারণ সঞ্চয় আমানতের উপর সুদের হার ৫% হইতে ৬% এবং সময় মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে সুদের হার সঞ্চয় কালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ৬% হইতে ৯'২৫% এ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ৯-১০% হইতে ১২-১৩% এ উন্নীত করা

হয়। পাট, পাটজাত দ্রব্য এবং চায়ের ক্ষেত্রে সুদের হার সুবিধাজনক স্তর ১০·৫০% এ নির্ধারণ করা হয়।

৪০। লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, সুদের হার পুনঃনির্ধারণের সময়, অগ্রাধিকার খাত সমূহ এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংককে পূর্ব হইতে প্রদত্ত সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়।

ঋণনীতি ও নিয়ন্ত্রন পদক্ষেপ সমূহ

৪১। অর্থনীতিতে প্রবল মুদ্রাস্ফীতির চাপের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণনীতির মূল লক্ষ্যগুলি হইতেছে (১) মোট ঋণের দ্রুত সম্প্রসারণ সংযত করা, (২) অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনীয় খাতে ঋণ সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা, এবং (৩) মওজুদদারী ও ফটকা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংক ব্যবহার বন্ধ করা। এই সমস্ত উদ্দেশ্যে, সুদের হার বর্ধিত করিয়া ঋণকে মহার্ঘ করা ছাড়াও, আলোচ্য বৎসরে কিছু সংখ্যক বিশেষ ঋণ নিয়ন্ত্রন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। এই পদক্ষেপগুলি নিম্ন প্রকার :

*(১) ১লা জুলাই, ১৯৭৪ হইতে স্থায়ী আমানত রসিদের বিপরীতে আগামের উপর আবশ্যিক "মার্জিন" রসিদের লিখিত মূল্যের ১০% ভাগ হইতে ৫০% ভাগে বর্ধিত করা হয়।

*(২) ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৪ হইতে ব্যক্তিগত খাতে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমানত বা বন্ধকীর বিপরীতে ব্যাংক আগামের উপর ৫০% ভাগ আবশ্যিক মার্জিন আরোপ করা হয় :

(ক) সর্ব প্রকার লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, যথা ঢেউটিন, এম-এস-বিলেট, রড, বার, এঙ্গেলস ইত্যাদি ;

(খ) সর্ব প্রকার রং, রসায়ন ও ঔষধ পত্র ;

(গ) সিমেন্ট ;

(ঘ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ;

(ঙ) দীর্ঘস্থায়ী আসবাবপত্র, যথা ফ্রিজিডেয়ার, টেলিভিশন এবং রেডিওসেট ইত্যাদি ;

(চ) নারিকেল তৈল ;

(ছ) সর্ব প্রকার মসলা ;

(জ) তুলা ও কৃত্রিম বস্ত্রাদি/সুতা/পাকান সুতা/হোশিয়ারী দ্রব্যাদি ;

(ঝ) সর্ব প্রকার শিশু/অক্ষমদের জন্য খাদ্য (টিনজাত অথবা অন্য প্রকার) এবং গ্লুকোজ-ডি ;

(ঞ) সাবান ও সোডা এবং

(ট) বিবিধ শিল্পজাত ভোগ্যপণ্য ও যে কোন প্রকার আমদানীকৃত পণ্য।

অধিকন্তু, ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় খাতে উল্লেখিত আগাম সমূহের ক্ষেত্রে অনুমোদনের ৬০ দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রধানতঃ উল্লিখিত দ্রব্যাদির মওজুদদারী এবং মূল্য বৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়।

*(৩) ২রা নভেম্বর, ১৯৭৪ হইতে ব্যাংক সমূহকে লাইসেন্স প্রাপ্ত রপ্তানীকারক ছাড়া অন্য কোন বেসরকারী পাট বনিক/ব্যবসায়ীকে পাটের বন্ধকী বা জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান না করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ৩০শে জুন, ১৯৭৫ পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

*(৪) ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৪ হইতে ব্যাংক সমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাহারা যেন চালু ক্ষমতা ও পুঁজি সম্পদ যথা চালু বাস, ট্রাক, গাড়ী এবং অন্যান্য সর্ব প্রকার যানবাহন ও লঞ্চ অথবা কলকব্জা এবং যে কোন প্রকার তৈরীমাল মওজুদের বিপরীতে ঋণ প্রদান না করে। তবে নুতন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেমন, নুতন বাস ও অন্যান্য ধরনের যানবাহন এবং লঞ্চ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যাংক আগাম প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়।

*(৫) ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৪ হইতে প্রাথমিক বন্ধক হিসাবে স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে সর্বপ্রকার ঋণ দান সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়।

*(৬) ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪ হইতে লবনের বিপরীতে আগামের উপর ৫০% ভাগ "মার্জিন" আরোপ করা হয়।

৪২। ব্যাংক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কেবলমাত্র বিশেষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং একই উদ্দেশ্যে কতিপয় অন্যান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করিয়াছে। মোটামুটিভাবে এইগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা গেল :

(ক) এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ছিল যে, সরকারী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ যেন যথোপযুক্ত ক্ষেত্রেই ঋণ প্রাপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্যে তপশিলী ব্যাংক সমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে কঠোরভাবে বানিজ্যিক বিবেচনার মাপকাঠিতেই যেন প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা হয়।

(খ) পাটকল, চিনিকল, কাপড়ের কল ও চামড়া কারখানা জাতীয় বৃহৎ ঋণ ব্যবহার-কারীদের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমান নির্ধারক নীতিও স্থাপন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য যেন ব্যাংক ঋণের সাহায্যে অতিমাত্রায় মালের মওজুদ গড়িয়া তোলা না হয়।

(গ) ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ হইতে তপশিলী ব্যাংক সমূহকে নিশ্চিত করিতে বলা হয় ;

(১) যেন, ১৯৭৪ বৎসরান্তের উপরে তাহাদের যেই পরিমাণ আমানত বৃদ্ধি পায় তাহার ২৫% ভাগ সর্বনিম্ন "লিকুইডিটি" অনুপাত রক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(২) যেন, আমানত বৃদ্ধির পরবর্তী ২৫% ভাগ দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে গৃহিত ঋণ পরিশোধ করতঃ এই ঋনের পরিমাণ হ্রাস করা হয় ; এবং

(৩) যেন, আমানত বৃদ্ধির অবশিষ্ট ৫০% ভাগ অগ্রাধিকার খাত সমূহের ঋণ চাহিদা মিটাইবার কাজে ব্যবহার করা হয়। অগ্রাধিকার খাত হিসাবে সামরিক ভাবে পাট, খাদ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

ব্যাংক সুবিধাদি ও অর্থ সংস্থানে অগ্রগতি

শাখা বিস্তার

৪৩। ১৯৭৪-৭৫ সালে তপশিলী ব্যাংক সমূহ দেশাভ্যন্তরে মোট ১৩৫টি নূতন শাখা খোলে। সেই তুলনায় পূর্ববর্তী বৎসরে নূতন শাখা খোলা ১৯৬টি। নূতন শাখাগুলি চালু হওয়ায় দেশে সর্বমোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা ১৯৭৫ সালের জুন শেষে ১,৬২৬টিতে দাঁড়ায়। চালু শাখা সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যেই ব্যাংকগুলিতে নূতন শাখা খোলার ব্যাপারে কিছুটা ধীরগতি অনুসরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়।

৪৪। ষ্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া ১৯৭৫ সালের মে মাসে ঢাকায় একটি শাখা উদ্বোধন করে এবং জুন মাসে তপশিলীভুক্ত হয়। ইহার ফলে, আলোচ্য বৎসরের সমাপ্তিতে বাংলাদেশে মোট তপশিলীভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা ১২টিতে উন্নীত হয় এবং চালু বিদেশী ব্যাংকের সংখ্যা ৪টিতে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক ব্যাংক কারবার

৪৫। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোনালী ব্যাংক ভারতে তাহার প্রথম শাখা কলিকাতায় উদ্বোধন করে। নবেম্বর মাসে জনতা ব্যাংকও আবুধাবিতে একটি শাখা খোলে।

৪৬। পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনার অধীনে যুক্তরাজ্যে কর্মরত পুবালী, জনতা এবং উত্তরা ব্যাংক সমূহের শাখাগুলির ব্যবসা এবং কার্য্যাবলীর দায়িত্ব সোনালী ব্যাংক গ্রহন করে। এই দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয় ১৯৭৫ সালের মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে। এই ব্যবস্থা মূলতঃ দেশের দক্ষ কর্মকর্তা সহ অন্যান্য সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে যে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে একটি মাত্র বাংলাদেশী ব্যাংক কর্মরত রাখিবার নীতি অনুসারে গ্রহন করা হয়।

পাটের জন্য অর্থ যোগান

৪৭। ১৯৭৪-৭৫ সালের পাট মৌসুমে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা হইতে মোট ২৪২·৬৫ কোটি টাকা অর্থযোগানের বন্দোবস্ত করে। এই অংকের মধ্যে ১৬৬·১৫ কোটি টাকা আসিবে তপশিলী ব্যাংক সমূহের নিজস্ব সম্পদ হইতে, অবশিষ্ট ৭৬·৫০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক ইহার "বিল পুনর্বাট্টা প্রকল্পের" অধীনে প্রদান করিবে স্থির হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থার অধীনে, ক্রীত এবং বাট্টাকৃত রপ্তানী বিল সহ বকেয়া ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ মাত্রা ১৯৭৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ৩৩৪·০২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মূল্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের কারণে মন্থর গতিতে রপ্তানীই পাটের ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় অনাদায়ী ঋণের কারণ।

চায়ে অর্থ যোগান

৪৮। আলোচ্য বৎসরে চা রপ্তানীর জন্য অর্থ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইহার বিল পুনর্বাট্টা প্রকল্পের অধীনে ব্যাংক সমূহকে ২ কোটি টাকা প্রদান করে।

পাল্টা অর্থ সংস্থান সুবিধাদি

৪৯। ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইহার "পাল্টা অর্থ সংস্থান" সুবিধার অধীনে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রনালয়কে তপশিলী ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে ৭৬·০০ কোটি টাকার তহবিল সরবরাহ করে। ইহা ছাড়াও, বাংলাদেশ চিনি কল সংস্থা এবং বাংলাদেশ ট্যানারিজ কর্পোরেশনকে তাহাদের নগদ আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য যথাক্রমে ৮·০০ কোটি ও ১·০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

কৃষিতে অর্থ সংস্থান

৫০। কৃষি উন্নয়নের অত্যধিক গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছোট কৃষক এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহকে অর্থ যোগানের প্রয়োজনে ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন কৃষি ঋণ সংস্থাকে পাল্টা অর্থ সংস্থান করা অব্যাহত রাখে। এই সংস্থা সমূহকে ব্যাংক হারের ২% ভাগ নীচে সুদে অর্থ সরবরাহ করা হয় যাহাতে কৃষকগন সুবিধাজনক হারে ঋন পাইতে পারে। আলোচ্য বৎসরে কৃষি ঋণ সরবরাহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক একটি বার্ষিক অনুশীলন করে। উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ও প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বিবেচনায় মোট ঋণ লক্ষ্য মাত্রা নির্দ্ধারন করা হয় ৪৫'৭২ কোটি টাকা। ঋণ সংস্থা সমুহের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করা হয় :

বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক	টাকা	১৩'০০	কোটি
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	„	১৬'৭২	„
রাষ্ট্রায়ত্ব বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহ	„	১৬'০০	„
মোট টাকা :		৪৫'৭২	কোটি

১৯৭৪-৭৫ সালে মোট ২৯'৭২ কোটি টাকার লক্ষ্যের তুলনায় কৃষি ব্যাংক ও জাতীয় সমবায় ব্যাংক প্রকৃত পক্ষে ২৬'০৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদানে সমর্থ হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে প্রকৃত ঋণ প্রদানের পরিমান ছিল ১৯'৯০ কোটি টাকা।

৫১। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ সংস্থা সমুহকে ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে ঋণ অনুমোদন ও প্রদানের তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

কৃষি ঋণ সংস্থা সমূহকে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ধার

(কোটি টাকায়)

সংস্থা/বৎসর	১৯৭৩-৭৪		১৯৭৪-৭৫	
	অনুমোদন	প্রকৃত প্রদান	অনুমোদন	প্রকৃত প্রদান
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক	১১'০২	৬'৫০	১২'০০	৮'৬৭
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৩'৭৫	১৩'২২	১২'৮৯	১২'০৮
মোট :	২৪'৭৭	১৯'৭২	২৪'৮৯	২০'৭৫*

আলোচ্য বৎসরের শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকটে এই সমস্ত ঋণ প্রতিষ্ঠানের বকেয়া দেনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১'০৯ কোটি টাকা। ইহা ১৯৭৩-৭৪ সালের ৪৩'৮৩ কোটি টাকার তুলনায় ২'৭৪ কোটি টাকা নিম্নে থাকে।

৫২। বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের কৃষি উৎপাদনে অর্থ সংস্থান পরিকল্পনার আওতায় ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বৎসরে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহের জন্য মোট ১৬`০০ কোটি টাকার ঋণ লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নানাবিধ অসুবিধার কারণে ব্যাংক সমূহ প্রকৃত পক্ষে মাত্র ৮`৮১ কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রদান করিতে সমর্থ হয়।

৫৩। ঋণ সংস্থা সমূহকে, বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে প্রকল্প অনুযায়ী অর্থ সংস্থানে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প তৈয়ারী করার প্রচেষ্টা করা হয় যাহাতে তাহারা এই সমস্ত প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে। আলোচ্য বৎসরে টাংগাইল জেলার এইরূপ একটি এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়। এই এলাকার ছোট কৃষক, ভাগ চাষী এবং কুটির শিল্প সমূহের ঋণের প্রয়োজন নিরূপণ করাই ছিল এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যাংক পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্যানজাত উৎপাদন সম্পর্কিত একটি প্রকল্পের মূল্যায়ণ করে। ইহাতে বিনিয়োগ সম্ভাবনা নির্ধারণ করিয়া প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কৃষি ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়।

সরকারী রাজস্ব ও অর্থ-সংস্থান

১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেট

৫৪। ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় এবং ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ মূল রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। মূল রাজস্ব বাজেটে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৫৫৯`৩৭ কোটি টাকা এবং (অনুন্নয়নমূলক) রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৪৭০`২৩ কোটি টাকা। ইহার ফলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হিসাব করা হইয়াছিল ৮৯`১৪ কোটি টাকা। কিন্তু উৎসবের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় হিসাব করা হয় ৫৯৫`৫০ কোটি টাকা এবং সংশোধিত রাজস্ব ব্যয় ধরা হয় ৫৩১`১৩ কোটি টাকা। ফলে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৬৪`৩৭ কোটি টাকা।

৫৫। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেটে বিক্রয় কর, আয় কর, কর্পোরেশন কর, ষ্ট্যাম্প, বন এবং রেজিষ্ট্রিকরণ প্রভৃতি খাতে রাজস্ব-প্রাপ্তিবৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে, মোট আমদানীর পরিমাণ এবং কর আরোপনীয় পণ্যের, যথা : সিগারেট ও সিমেন্টের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলে, আমদানী শুল্ক এবং আবগারী শুল্ক, এই দুই প্রধান খাতে রাজস্বপ্রাপ্তি বিশেষভাবে হ্রাস পায়। যেই সকল খাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইগুলি হইতেছে—আয়কর, কর্পোরেশন এবং কৃষি আয়কর (+২০`৭৩ কোটি টাকা ), বিক্রয়কর ( +১২`০০ কোটি টাকা), ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন (+৭`৫০ কোটি ), রেলপথ ( +৫`২২ কোটি টাকা) এবং বন (+১`৭৫ কোটি টাকা)। বিভিন্ন স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা হইতে বকেয়া পাওনা আদায়ের ফলে আয়কর, কর্পোরেশন এবং কৃষি আয়কর হইতে রাজস্ব প্রাপ্তি বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে, আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বিক্রয়কর বাবদ প্রাপ্তি বৃদ্ধি পায়।

---

* পূর্ববর্তী বৎসরে অনুমোদনের বিপরীতে ৩`৪২ কোটি টাকা সহ।

৬০। উন্নয়ন বাজেটে নির্বাচিত মোট ৯৫০ কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে ৭০০ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৭৩ ভাগ পাওয়া যাইবে বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের মাধ্যমে। পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরে বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের পরিমাণ ছিল উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা ৮৪ ভাগ। সুতরাং, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরে উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইবে আশা করা যায়।

৬১। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরের কর বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলীর সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১) শুধু দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া, সিগারেট কাগজের উপর আরোপিত শুল্কহার বর্তমানে শতকরা ১০০ ভাগ মূল্যভিত্তিক। উক্ত দুইটি ক্ষেত্রেও শুল্কহারের তারতম্য বিধানের এবং শুল্ক ফাঁকি রোধের উদ্দেশ্যে শুল্কহার সামগ্রিকভাবে শতকরা ১০০ ভাগ মূল্য ভিত্তিক করা হইয়াছে।

২) কৃত্রিম আঁশের সুতার উপর আরোপিত শুল্কহারের অসামঞ্জস্য দূর করার উদ্দেশ্যে বর্তমান পরিমাণ ভিত্তিক হারগুলি বিলোপ করিয়া শতকরা ৫০ ভাগ মূল্যভিত্তিক শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে।

৩) লুব্রিকেটিং তৈলের উপর বর্তমানে ধার্য্য প্রতি গ্যালন ৩'২৫ টাকা এবং ২'৫০ টাকা শুল্কহারের স্থলে যথাক্রমে ৩৫ ভাগ এবং ৩০ ভাগ মূল্য ভিত্তিক শুল্কারোপ করা হইয়াছে।

৪) কর আরোপনীয় আয়ের নিম্নসীমা ৬,০০০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৮,৪০০ টাকা করা হইয়াছে।

৫) কর রেয়াতের জন্য ছেলে মেয়েদের শিক্ষা বাবদ খরচের পরিমাণ ৯০০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ১,৫০০ টাকা করা হইয়াছে।

৬) কর রেয়াতের জন্য বিবাহিত কর দাতাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাতা অতিরিক্ত ১,০০০ টাকা করা হইয়াছে।

৭) বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আপ্যায়ন ভাতা আয়কর মুক্ত করা হইয়াছে।

৮) নূতন বাস গৃহাদি নির্মাণে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আরো পাঁচ বৎসরের জন্য বাৎসরিক ৮,৪০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ীভাড়া আয়কর মুক্ত রাখা হইয়াছে।

৯) কর মুক্ত নীট সম্পদের নিম্নসীমা দুই লক্ষ টাকা হইতে বাড়াইয়া চারি লক্ষ টাকা করা হইয়াছে।

১০) সম্পদ করের সর্বোচ্চহার শতকরা ৬ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা ৩ ভাগ ধার্য এবং তদনুযায়ী হার-কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে।

১১) পাইকারী বিক্রেতার ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথা বিলোপ করা হইয়াছে এবং লাইসেন্সধারী প্রস্তুতকারককে স্থানীয় অথবা আমদানী পর্যায়ে কাঁচামাল ক্রয় করার সময় বিক্রয় কর পরিশোধ করিতে হইবে। পরে কর নির্ধারণ চূড়ান্ত হইলে প্রদত্ত করের ক্রেডিট দেওয়া হইবে।

১২) বাড়ীভাড়া কর রহিত করা হইয়াছে।

১১) উৎকর্ষ কর এবং জলযানের উপর কর, মাল পরিবাহী মটরযানের উপর কর এবং যাত্রী ও মালের ভাড়ার উপর 'টোল' রহিত করা হইয়াছে।

সরকারের ঋণ

৬২। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোন নূতন (দীর্ঘ মেয়াদী) ঋণ পত্র বাজারে ছাড়া হয় নাই। বর্তমানে শুধু মাত্র সরকারের "৫½% ঋণ, ১৯৮২" যাহা ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে ছাড়া হইয়াছিল তাহা অপরিশোধিত আছে। এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৬১,৭৫,০১,০০০ টাকা।

৬৩। বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা হার সুদে যে ত্রৈমাসিক সরকারী ট্রেজারী বিল ছাড়া হইয়াছিল, ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭'০১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের একই সময়ে ইহার পরিমাণ ছিল ৪৯'৪৫ কোটি টাকা। এই বিলসমূহ প্রতি ৯০ দিন অন্তর অন্তর পুনঃ ইস্যুকরা হয়। ইহা ব্যতীত, পূর্বে অপসারিত পাকিস্তানী নোটের জন্য এবং বাংলাদেশের নোট জারীর বিপরীতে আইনানুগ প্রয়োজনীয় সম্পদ রক্ষনের উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য কারণে যে এডহক বিল সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন তারিখের ৩৫৪'১২ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে ৪০৮'৯৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। সরকার "ওয়েজ এণ্ড মীনস" নামীয় আগামের সর্বোচ্চ সীমার উর্দ্ধে যে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা তুলিয়া লইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে ট্রেজারী বিল ছাড়ার ফলেই এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। সরকারকে প্রদত্ত 'ওয়েজ এণ্ড মীনস' আগামের পরিমাণ ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে ২০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। উপরোক্ত ঋণ ছাড়াও, সরকারের "ডেবিট ব্যালেন্সের" পরিমাণ ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনের ৯,৫০,২১,০০০ টাকার তুলনায় ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ৯,০৫,৮৪,০০০ টাকায় দাঁড়ায়।

সরকারী সিকিউরিটি সমূহের পুনঃ বৈধকরণ

৬৪। ১৯৭২ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান এবং তাহার প্রাদেশিক সরকারের যে সমস্ত "প্রমিসরী নোট" এবং সার্টিফিকেট সমূহ বাতিল ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাগরিক এবং সংস্থা সমূহ কর্তৃক জমা দেওয়া হইয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে তাহা পুনঃ বৈধ করা হইয়াছে।

সেভিংস সার্টিফিকেট/ সঞ্চয় পত্র

৬৫। যে সমস্ত ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বা তাহার পূর্বে তদানিন্তন পাকিস্তান হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল এবং যাহা বাতিল ঘোষিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাগরিক কর্তৃক জমা দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুনঃ বৈধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পাকিস্তানী প্রাইজবণ্ড, এন-আই-টি ইউনিটস্ এবং আই-সি-পি মিউচুয়াল ফাণ্ডের পরিবর্তে বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র প্রদান আলোচ্য বৎসরে অব্যাহত থাকে।

প্রাইজবণ্ড

৬৬। ১৯৭৪ সালের জুন মাস হইতে বাংলাদেশ প্রাইজবণ্ডের যে বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহা আলোচ্য বৎসরে অব্যাহত থাকে। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট বণ্ড বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১'৬৪ কোটি টাকা। এই পর্যন্ত এ, বি, সি এবং ডি এই চারিটি সিরিজের বণ্ড চালু করা হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং লেনদেনের ভারসাম্য

৬৭। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল ভারসাম্য ১৯৭৪-৭৫ সালেও অব্যাহত থাকে। পণ্যদ্রব্য খাতে (দৃশ্যমান রপ্তানী বাদ আমদানী) ঘাটতির পরিমাণ জুলাই, ১৯৭৩—মার্চ, ১৯৭৪ সময়ের ২৬৬'৬ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৪-৭৫ সালের একই সময়ে ৩৮২'৪ কোটি টাকায় উপনীত হয়। অনুরূপভাবে "সার্ভিসেস" (অদৃশ্যমান রপ্তানী বাদ আমদানী) খাতে পূর্ববর্তী বৎসরের প্রথম নয় মাসের ৫০ কোটি টাকা ঘাটতির তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালের একই সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৬৮। বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে অবশ্য বৎসরের প্রথম নয় মাসে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের ৬'৯০ কোটি টাকা ঘাটতির স্থলে আলোচ্য বৎসরের সাকুল্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫৯'৭০ কোটি টাকা। অপরিশোধ্য বৈদেশিক অর্থ সমাগমে বিশেষ বৃদ্ধি এবং নিট মূলধন প্রাপ্তিই লেনদেনের ভারসাম্যের অনুকূলতার প্রধান কারণ। ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং ইহা ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের শেষে ১৮৬'৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধিতে প্রধানতঃ বন্ধুভাবাপন্ন দেশসমূহ হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল হইতে গৃহীত তৈল সাহায্যই প্রতিফলিত হইয়াছে।

৬৯। সার্বিক লেনদেনে উদ্বৃত্ত থাকার ফলে আলোচ্য বৎসরে বাণিজ্য খাতে দেশের বিপুল ঘাটতি চাপা পড়িয়া যায়। ১৯৭৪ সালের জুলাই হইতে ১৯৭৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে পণ্যদ্রব্য এবং সার্ভিস খাতে সর্বমোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৭'৪০ কোটি টাকায়। পূর্ববর্তী বৎসরের একই সময়ে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩১৬'৬০ কোটি টাকা।

বাণিজ্য নীতি

৭০। ১৯৭৪-৭৫ বাণিজ্য মৌসুমে দেশের রপ্তানী প্রাথমিকভাবে ৩৪৮'০০ কোটি টাকায় স্থির করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করিয়া ৩৩২'০০ কোটি টাকা ধরা হয়। অপরদিকে, ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ছিল ২৫২'০০ কোটি টাকা। মোট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে, কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া যথাক্রমে ৯৬'২০ কোটি টাকা এবং ১৯০'০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইবে। অন্যান্য পণ্যদ্রব্য, যেমন মাছ, চিংড়ী, বরফজাত বাগদা চিংড়ী এবং মশলা প্রভৃতি রপ্তানী হইতে মোট ৪৫'৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা ধরা হয়।

রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা

৭১। ১৯৭৪ সালের জুলাই-ডিসেম্বর বাণিজ্য মৌসুমে আমদানী ব্যয় নির্বাহের জন্য ২২০'০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা পূর্ববর্তী মৌসুমের বরাদ্দ অপেক্ষা শতকরা ৩২ ভাগ কম। বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে আমদানী বরাদ্দে এই সংকোচন করা হয়। মোট

বরাদ্দের মধ্যে, প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানীর জন্য ৩০'৪০ কোটি টাকা এবং শিল্পের কাঁচামাল এবং যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য বরাদ্দ করা হয় ১৮৪'৬০ কোটি টাকা; সরকারী এবং বেসরকারী খাতে যথাক্রমে ১৪০'৯০ কোটি টাকা এবং ৪৩'৭০ কোটি টাকা নির্ধারিত ছিল। সরকার

আমদানী নীতি

পরিচালিত শিল্প সমূহকে তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পূর্বের ন্যায় টি, সি, বি-র মাধ্যমে আমদানী করার পরিবর্তে সরাসরি আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, রপ্তানী কারকগণ 'এক্সপোর্ট পারফরমেন্স ব্যবস্থা'র অধীনে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থা টি, সি, বি-র তালিকাভুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। আলোচ্য আমদানী নীতিতে প্রবাসী বাঙালীদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানীর প্রচলিত স্কীমটির পরিধি সম্প্রসারণ করা হয় এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং যন্ত্রাংশকে আমদানী তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত স্কীমের অধীনে আমদানীকৃত দ্রব্যাদি 'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আইনে'র অধীনে মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা হয়।

১২। সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এবং বৈদেশিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী-জুন বাণিজ্য মৌসুমে আমদানীর জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। আলোচ্য মৌসুমে আমদানী ব্যয় নির্ধারিত হয় ৩০০ কোটি টাকা। দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে আমদানী নীতিতে শিল্প খাতে কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য যথাযথ সুবিধা প্রদান করা হয়। মোট বরাদ্দের মধ্যে, ২৩৪ কোটি টাকা কাঁচামাল এবং যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য এবং অবশিষ্ট ৬৬ কোটি টাকা ভোগ্যপণ্য আমদানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যেমন: পাট, চিনি, কাপড়, ঔষধ, কাগজ, সার, তৈল শোধনাগার, চা, চামড়া এবং বরফজাত চিংড়ী প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবাধ লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রবাসী বাঙালীদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানীর প্রচলিত স্কীমের অধীনে আমদানীযোগ্য পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা ৫৪টি হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৭৩টি করা হইয়াছে। অবশ্য, উক্ত স্কীমের অধীনে অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানী উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উচ্চমানের কৃত্রিম আঁশ হইতে প্রস্তুত কাপড়ের আমদানী শুল্কহার শতকরা ১০০ ভাগ হইতে ২০০ ভাগে বৃদ্ধি করা হয়।

রপ্তানী পণ্যের গতিধারা

১৩। ১৯৭৪-৭৫ সালে দেশে অধিকাংশ রপ্তানী পণ্যের বাজার মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল থাকে। এই বৎসরে কাঁচা পাট ও চায়ের মূল্যে ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য, ছাগলের চামড়া ব্যতীত অন্যান্য পশুচর্ম ও চামড়ার মূল্য বিগত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নিম্নগামী হয়। বিরূপ আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশ্ববাজারে মন্দার দরুণ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী দ্রুত হ্রাস পায়।

১৪। ১৯৭৪-৭৫ সাল পাটের জন্য সর্বাপেক্ষা মারাত্মক মওসুম ছিল। পাট এবং চাউলের মূল্যের প্রতিকূল অনুপাতের ফলে পাট চাষের জমির পরিমাণ প্রায় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। তদুপরি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও বন্যার দরুণ পাটের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায়

শতকরা ৩৫ ভাগ হ্রাস পাইয়া মাত্র ৪০ লক্ষ বেলে দাঁড়ায়। ইহা ছিল গত দশ বৎসরের
পাট মধ্যে সর্বনিম্ন উৎপাদন মাত্রা। পূর্ববর্তী বৎসরের জমা ২৩·৫৮ লক্ষ বেল সহ ১৯৭৪-৭৫ সালে পাটের সর্বমোট যোগান ছিল ৬৩·৫৮ লক্ষ বেল। অথচ পূর্ববর্তী মওসুমে মোট সরবরাহ ছিল ৮৩·৬১ লক্ষ বেল।

৭৫। বিগত মওসুমের ৫৫·১৬ লক্ষ বেলের তুলনায় আলোচ্য সর্বমোট ৩৮·৭৬ লক্ষ বেল পাট দেশের বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রে আমদানী হয়।

৭৬। ১৯৭৩-৭৪ সালের ৩৩·১৯ লক্ষ বেলের তুলনায় বিবরণীয় বৎসরে মাত্র ১০·১৮ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা ২০·০০ লক্ষ বেলের স্থলে ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রকৃত রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫·৪৮ লক্ষ বেল। অপরপক্ষে, ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রকৃত রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৬·৬২ লক্ষ বেল।

৭৭। স্বল্প উৎপাদনের ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ফটকা ব্যবসায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে সর্বনিম্নজাত ক্রসবটম পাটের মূল্য মণ প্রতি ৭১·৫০ টাকা হইতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৪ সালের ১২ই নভেম্বরে মণ প্রতি ১২৬·০০ টাকায় দাঁড়ায়। তারপর মূল্যে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়, এবং উঠানামার মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৪ই মে তারিখে প্রতিমণ ৯৪·০০ টাকায় এবং উহা ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত চলিতে থাকে। তবুও, পূর্ববর্তী বৎসরান্তের দামের তুলনায় সকল প্রকার পাটের মূল্য আলোচ্য বৎসর শেষে অনেক বেশী থাকে।

৭৮। আভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ৩১শে অক্টোবরে বি-ডব্লিউ-ডি গ্রেড পাটের রপ্তানী মূল্য টন প্রতি ১৫০ পাউণ্ড হইতে ২০০ পাউণ্ডে বৃদ্ধি করা হয় এবং উহা ১৯৭৫ সালের ৮ই মে পর্যন্ত স্থির থাকে। ৯ই মে তারিখে প্রতি টনের মূল্য ১৮০ পাউণ্ডে পুনঃ নির্ধারিত হয়, এবং ১৯৭৫ সালের ১৭ই মে তারিখে বিনিময় হারের সমন্বয় বিধানের ফলে ৪ঠা জুন, ১৯৭৫ হইতে প্রতি টনের মূল্য ১৬০ পাউণ্ড স্থির করা হয়।

৭৯। ১৯৭৪-৭৫ সালে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫·৬০ লক্ষ টনের স্থলে প্রকৃত উৎপাদন ৪·৪৪ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসরে উৎপাদন ছিল ৫·০০ লক্ষ টন। অধিকহারে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি, নিম্নমান দক্ষতা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং বিশ্বের বাজারে চট ও কার্পেট ব্যাকিং এর মন্দা চাহিদার ফলে আলোচ্য বৎসরে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। তদুপরি,
পাটজাত কাঁচাপাটের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কেননা কাঁচাপাটের
দ্রব্য ক্রয় মূল্য বাবদ খরচা পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়ের শতকরা ৪২-৪৫ ভাগ। কাজেই অন্যান্য রপ্তানীকারক দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত দ্রব্য প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এই বৎসরে গড়ে ২৩,১২৬টি স্থাপিত তাঁতের মধ্যে ১৭,৯৮০টি অথবা শতকরা ৭৮ ভাগ তাঁত চালু থাকে। পূর্ববর্তী বৎসরে শতকরা ৮২ ভাগ তাঁত চালু ছিল।

৮০। পূর্ববর্তী বৎসরের ৪'৯২ লক্ষ টনের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে ৩'৯২ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে রেজিষ্ট্রি করা হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৭৩-৭৪ সালের ৪'৩৮ লক্ষ টন প্রকৃত রপ্তানীর তুলনায় আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৩'৭৭ লক্ষ টন রপ্তানী হয়।

৮১। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে পাটজাত দ্রব্যের মওজুদ পূর্ববর্তী বৎসরের একই সময়ের ১'১৪ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১'২৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়।

চা*

৮২। ১৯৭৪-৭৫ মওসুমে চা শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। বিগত মওসুমের ৬১১'০ লক্ষ পাউণ্ড এবং স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৭০-৭১ সালের সর্বোচ্চ ৬৮৫'৮ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপাদনের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ মওসুমে ৭০৯'২ লক্ষ পাউণ্ড সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ চা উৎপাদিত হয়। পূর্ববর্তী মওসুমের ১২৭'০ লক্ষ পাউণ্ড জমা চা সহ ১৯৭৪-৭৫ মওসুমে মোট চায়ের যোগানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৩৬'২ লক্ষ পাউণ্ড। বিগত মওসুমে মোট যোগান ছিল ৭৯৪'৭ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে ১৯২'৯ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপাদনের তুলনায় ১৯৭৫ সালের একই সময়ে ১৪৯'২ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপাদিত হয়।

৮৩। ১৯৭৪-৭৫ মওসুমে সর্বমোট ২৩টি নিলামে ৬২৩'৯ লক্ষ পাউণ্ড চা বিক্রয় হয়। প্রতি পাউণ্ড চা এর গড় মূল্য ছিল ৩'২৫ টাকা। পূর্ববর্তী মওসুমে প্রতি পাউণ্ড ২'১২ টাকা গড় দরে মোট ৪৫৯'৪ লক্ষ পাউণ্ড চা নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল।

৮৪। রপ্তানীর জন্য নির্দিষ্ট ৬০০'০ লক্ষ পাউণ্ড চায়ের মধ্যে ১৯৭৪-৭৫ মওসুমে (এপ্রিল-মার্চ) ৪৪৯'৭ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী করা হয়। চা বাক্সের স্বল্পতা ও জাহাজে স্থানাভাবের দরুণ চা রপ্তানীতে ঘাটতি দেখা দেয়। অবশ্য, পূর্ববর্তী মওসুমে ৫০৭'৭ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইতে অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রা ১০'০৫ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫'৭২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৭৪ সালের জুলাই হইতে ১৯৭৫ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে ৫১৭'৬ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী বাবত মোট ১৯'০৭ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তুলনামূলকভাবে, ১৯৭৩-৭৪ সালে ৪৪৪'৬ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইতে অর্জিত হইয়াছিল ১০'২৯ কোটি টাকা। বর্তমান মওসুমের প্রথম তিন মাসে (এপ্রিল-জুন, ১৯৭৫) ১৩৮'৫ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী করিয়া ৫.৩২ কোটি টাকা অর্জিত হয়।

পশুচর্ম ও চামড়া

৮৫। আনুমানিক ৩০ লক্ষ গরুর চামড়া, ১ লক্ষ মহিষের চামড়া, ৭০ লক্ষ ছাগলের চামড়া এবং ৩ লক্ষ ভেড়ার চামড়াসহ ১৯৭৪-৭৫ সালে মোট ১০৪ লক্ষ চামড়ার যোগান হিসাব করা হয়। এই বৎসরে চামড়ার মূল্য যথেষ্ট উঠা-নামা করে। একমাত্র ছাগলের চামড়া ব্যতীত অন্যান্য পশুচর্ম ও চামড়ার দাম পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় সাধারণভাবে নীচে থাকে। বিশেষতঃ মহিষ ও ভেড়ার চামড়ার মূল্যে সারা বৎসর মন্দা ভাব পরিলক্ষিত হয়।

৮৬। ১৯৭৩-৭৪ সালের ৭'১৭ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে (প্রথম এগার মাসে) বাংলাদেশের কাঁচা পশুচর্ম ও চামড়ার রপ্তানী মূল্য ১১'১৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

---

* মওসুম : এপ্রিল-মার্চ।

বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি

বিনিময় হার

৮৭। ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে নির্ধারিত ১ পাউণ্ড=১৮·৯৬৭৭ টাকা বিনিময় ১৯৭৫ সালের ১৭ই মে পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৯শে মে হইতে কার্যকরী ১ পাউণ্ড=৩০ টাকার নূতন বিনিময় হার প্রবর্তন করা হয়।

৮৮। যে নূতন হারে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলার হইতে পাউণ্ড ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করে তাহা নিম্নরূপ।

প্রতি পাউণ্ড—ষ্টার্লিং ক্রয়		প্রতি পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিক্রয়
	৩ মাস পর্যন্ত	
তাৎক্ষনিক	আগাম ক্রয়ের হার	তাৎক্ষনিক
২৯·৯৮৪৪ টাকা	২৯·৯৮৪৪ টাকা	৩০·০১১১ টাকা

৮৯। বিনিময় হারে সমন্বয় সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:—

(১) ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে প্রবর্তিত "হোম রেমিটেন্স প্রিমিয়াম স্কীম" প্রবাসী বাঙালীদের স্বদেশে অর্থ প্রেরণ প্রিমিয়াম প্রথা বাতিল করা হয়।

বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ

(২) বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশ ভ্রমণের জন্য ভাতা ও বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের উপর ১৯৭৪ সালের ১লা জুলাই হইতে আরোপিত শতকরা ৩০ ভাগ কর রহিত করা হয়।

(৩) ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রবর্তিত রপ্তানীর উপর নগদ ভর্তুকী ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

৯০। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের নিকট ২৭০·৮০ মিলিয়ন এস, ডি আর এর সমান বাংলাদেশী টাকা ছিল। ১৯৭৫ সালের জুন পর্যন্ত তহবিলের নিকট বাংলাদেশের অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪৬·৯৭ মিলিয়ন এস, ডি, আর। ১৯৭২ সালে গৃহীত "রপ্তানী ক্ষতি পূরণ অর্থ যোগান" সুবিধার অধীনে ৬২·৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর, ১৯৭৪ সালের "তৈল সুবিধার" অধীনে ৫১·৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর এবং ১৯৭৪ সালের জুনে প্রথম ঋণ কিস্তির অধীনে ৩১·২৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর ইহার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের মে মাসে ২০·৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর পুনঃক্রয় করে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তহবিল হইতে ২১·৮০* মিলিয়ন এস, ডি, আর ক্রয় করে।

কারেন্সী নোট ও মুদ্রা ব্যবস্থা

একশত টাকার নোট অচলিকরণ

৯১। ১৯৭৫ সালের ৭ই এপ্রিল হইতে একশত টাকার নোট অচল ঘোষণা করা হয়। আট শত টাকা পর্যন্ত জমাদানকারীকে পূর্ণ বিনিময় মূল্য নগদ প্রদান করা হয়। আট শত টাকার উর্দ্ধে জমাদানকারীদের ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্য আংশিক নগদ এবং আংশিক ৮ টাকা সুদে ৫ হইতে ৭ বৎসর মেয়াদী বিনিময় ও হস্তান্তরের অযোগ্য সরকারী বণ্ডে প্রদান করা হইতেছে।

* ২১,৭৯৭,৪৯৯ এস, ডি, আর

মুদ্রা

৯২। এক পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার নূতন বাংলাদেশী মুদ্রা যথাক্রমে ১৯৭৪ সালের ১৫ই জুলাই এবং ২রা ডিসেম্বর হইতে চালু করা হয়। এযাবৎ প্রচলিত সমস্ত মুদ্রা বৈধ থাকে। তদুপরি, ১৯৭৪ সালের ২রা ডিসেম্বরে বিশেষ স্মারক চিহ্ন যথা "উৎপাদন বাড়ান", "সবুজ বিপ্লব" এবং "সবার জন্য খাদ্য" সহকারে ৫, ১০ ও ২৫ পয়সার মুদ্রা চালু করা হয়।

৯৩। প্রচলিত (খুচরা) দশমিক মুদ্রা ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনে ৭`৩০ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে ৯`১২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ইহা ছাড়া, প্রচলিত এক টাকার নোট/মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ২০`৩১ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য বৎসরের ৩০শে জুনে ২৪`৭৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

প্রশাসন

নিয়োগ

৯৪। ১৯৭৪ সালের ১৬ই নভেম্বরে জনাব এ, কে, এন, আহমদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে জনাব এ, এন, হামিদুল্লাহ্‌র স্থলে কার্যভার গ্রহণ করেন।

৯৫। ১৯৭৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে জনাব এ, এফ, এম, নুরুল মতিন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদে জনাব কে, এ, রশীদের স্থলে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

চাকুরীর সর্তাবলীর উন্নয়ন

৯৬। সরকারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্যকরী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারদের বেতন ও ভাতা পরিবর্তন করিয়া জাতীয় গ্রেড সমূহের পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রেড প্রবর্তন করে।

৯৭। বাসস্থানের তীব্র সমস্যা লাঘব করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্মচারী/অফিসারদের জন্য অতিরিক্ত বাস গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে।

বাংলা ভাষায় অফিসের কাজ

৯৮। বাংলা ভাষায় অফিসের কাজ ও আদান প্রদান সম্পন্ন করার জন্য ব্যাংক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রায়োগিক ব্যাংকিং শব্দাবলীর পরিবর্তে যথোপযুক্ত বাংলা প্রতি শব্দ নির্ধারণের জন্য ব্যাংকারদের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

ব্যালেন্স শীট

ইস্যু বিভাগ

৯৯। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে ইস্যুবিভাগের ব্যালেন্সশীট রিপোর্টের ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উক্ত তারিখে মোট ইস্যুকৃত নোটের পরিমাণ ছিল ২৮৩`৩৬ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের অনুরূপ তারিখে ইহার পরিমাণ ৩২৫`৮৩ কোটি টাকা ছিল। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে ১০০ টাকার নোট অচলনই এই হ্রাসের প্রধান কারণ। ইস্যুকৃত এই নোটের বিপরীতে সম্পদের মধ্যে ৬০`০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা, ৬`৪৭ কোটি টাকার দেশীয় মুদ্রা এবং ২১৭`১৯ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র (সিকিউরিটি) অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুলনামূলকভাবে, ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনে মোট ইস্যুর বিপরীতে সম্পদের

মধ্যে ছিল ৬০·০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা, ১০·৮৭ কোটি টাকার দেশীয় মুদ্রা, ২৪০·৬১ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র এবং ১৪·৩৫ কোটি টাকার আভ্যন্তরীন বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্র।

ব্যাংকিং বিভাগ

১০০। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে ব্যাংকিং বিভাগের ব্যালান্সশীট ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। দায়ের খাতে বৃদ্ধির কারণ সমূহের মধ্যে, ৫·০০ কোটি টাকা উপযোজনের ফলে বিধিবদ্ধ (সংরক্ষিত) তহবিল সমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক সমূহের আমানতের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ৯১·১৭ কোটি টাকার স্থলে ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে ৯২·৫৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের হিসাব সমূহ সমেত "অন্যান্য আমানতের" পরিমাণ ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে ছিল ২৪৭·৬৫ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের একই তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ১৯১·০৫ কোটি টাকা।

১০১। সম্পদ খাতে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে বাংলাদেশের বাহিরে রক্ষিত ব্যালেন্সের পরিমাণ ছিল ২৬০·৮০ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের একই সময়ে ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১·৩৬ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে সরকারকে প্রদত্ত "আগাম ও ঋণের" পরিমাণ ২০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে, তবে "সরকারী ডেটর ব্যালেন্স" পূর্ববর্তী বৎসরের একই সময়ে ৯·৫০ কোটি টাকার স্থলে ৯·০৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে "অন্যান্য ঋণ ও আগামের" মোট পরিমাণ ছিল ৯৬·৪৭ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের একই সময়ে ইহার পরিমাণ ছিল ৫৪·৫৩ কোটি টাকা। ব্যাংকের লগ্নি ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনের ১১০·৪৪ কোটি টাকার স্থলে ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে ১৯১·৬৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির কারণ প্রধানতঃ সরকারকে অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অস্থায়ী ঋণ পত্রে বিনিয়োগ।

বার্ষিক হিসাব

১০২। ব্যাংকের ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বৎসরের ব্যালান্সশীট ও লাভ ক্ষতির হিসাব ২৯-৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১০৩। ১৯৭৪ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকের লাভ ক্ষতির সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নরূপ :

মোট আয়	৩৪,২২,১৭,৩৬১	টাকা
মোট ব্যয়	৬,৮১,৮২,৭০০	টাকা
লাভ :	২৭,৪০,৩৪,৬৬১	টাকা

১০৪। ১৯৭৪-৭৫ সালের উপরোক্ত মোট লাভ ২৭,৪০,৩৪,৬৬১ টাকা হইতে সরকারের নিকট ২২,৪০,৩৪,৬৬১ টাকা হস্তান্তর করা হইবে। বাকী টাকা নিম্ন হিসাবমতে ব্যাংকের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ (সংরক্ষিত) তহবিলে প্রদান করা হইবে :

গ্রামীন ঋণ তহবিল	১,২৫,০০,০০০	টাকা
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	১,০০,০০,০০০	"
শিল্প ঋণ তহবিল	১,২৫,০০,০০০	"
রপ্তানী ঋণ তহবিল	১,৫০,০০,০০০	"
মোট :	৫,০০,০০,০০০	টাকা

নিরীক্ষক নিয়োগ

১০৫। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ এর ৬৫ (১) ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য বাংলাদেশ সরকার মেসার্স এস, এফ, আহমেদ এ্যাণ্ড কোম্পানী এবং মেসার্স রহমান, রহমান হক এ্যাণ্ড কোম্পানী নামক দুইটি চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্মকে নিয়োগ করেন।

১০৬। পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বৎসরে ব্যাংকের অফিসারগণ ও কর্মচারীবৃন্দ গভীর নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

ব্যালান্স শীট

ও

লাভ ক্ষতির হিসাব

১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখ অনুসারে

বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যালান্সশীট—৩০শে জুন, ১৯৭৫

ইস্যু বিভাগ

দায় সমূহ	টাকা	টাকা	সম্পদ সমূহ	টাকা	টাকা
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট সমূহ	১২,৭০,৪৯০		১ (ক) স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড	নাই	
			রৌপ্যপিণ্ড	নাই	
বাজারে প্রচলিত নোট সমূহ*	২৮২,৯৩,৬২,৯৮০		আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস, ডি, আর	নাই	
			অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা	৬০,০০,০০,০০০	৬০,০০,০০,০০০
মোট ইস্যুকৃত নোট সমূহ		২৮৩,৬৬,৩২,৬৭০			
			(খ) এক টাকার মুদ্রা	৬,৪৭,৩৩,১৬৯	
			বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র**	২১৭,১৮,৯৯,৫০১	
			আভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্র	নাই	২২৩,৬৬,৩২,৬৭০
মোট দায়		২৮৩,৬৬,৩২,৬৭০	মোট সম্পদ		২৮৩,৬৬,৩২,৬৭০

*এইখানে উল্লেখিত বাজারে প্রচলিত নোটের পরিমাণের সাথে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান/পাকিস্তান সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংক/বাংলাদেশ সরকার বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অনুরূপ নোটের জন্য যে মূল্য দাবী করিবে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

**পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট প্রচলন করার বিপরীতে সম্পদরক্ষনের উদ্দেশ্যে দুই এককে (অস্থায়ী) ট্রেজারী বিল ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট

দায় সমূহ	টাকা	সম্পদ সমূহ	টাকা
পরিশোধিত মূলধন	৩,০০,০০,০০০	নোট সমূহ	৭২,৭০,৪৯০
সংরক্ষিত তহবিল	৩,০০,০০,০০০	এক টাকার মুদ্রা	৮৩,৭২৮
গ্রামীন ঋণ তহবিল	২,৭৫,০০,০০০	খুচরা মুদ্রা	১,৮৫,৬৭৪
শিল্প ঋণ তহবিল	৩,৫০,০০,০০০	ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল সমূহ :	
রপ্তানী ঋণ তহবিল	৩,৭৫,০০,০০০	(ক) আভ্যন্তরীণ	২৮,২১,০০,০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীল করণ তহবিল	২,২৫,০০,০০০	(খ) বৈদেশিক	নাই
		(গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	নাই
		বাংলাদেশের বাহিরে রক্ষিত ব্যালেন্স	২৯০,৮০,২৬,৯১০
আমানত সমূহ :		আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে	নাই
(ক) সরকার	নাই	রক্ষিত এস, ডি, আর	
(খ) ব্যাংক সমূহ	৯২,৫৯,৪২,৮৫৬	সরকারকে প্রদত্ত "ঋণ ও আগাম"	২০,০০,০০,০০০
(গ) অন্যান্য	২৪৭,৬৪,৭৬,১৩৪	সরকারের "ডেটর ব্যালেন্স"	৯,০৫,৮৩,০৩২
এস, ডি, আর এর বরাদ্দ	নাই	অন্যান্য ঋণ ও আগাম	৯৬,৪৬,৭৯,৫০০
দের বিল	১৪,৬৮,০০০	লগ্নি সমূহ	১৯১,৬৮,২৭,৯৪০
অন্যান্য দায় সমূহ	২৯২,৮৪,৪৩,৭৭০	অন্যান্য সম্পদ সমূহ	১৪,৫০,৭৩,৪৮৬
মোট দায়	৬৫১,৪৮,৩০,৭৬০	মোট সম্পদ	৬৫১,৪৮,৩০,৭৬০

*নগদ ও স্বল্প-মেয়াদী ঋণ পত্র সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

লাভ ক্ষতির হিসাব

বৎসারন্ত ৩০শে জুন, ১৯৭৫

আয়

সুদ, বাট্টা, বিনিময়, কমিশন ইত্যাদি	...	...	৩৪,২২,১৭,৩৬৩	টাকা

ব্যয়

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	...	...	২,৩৩,৭৮,২৪১	"
পরিচালকদের ফিস ও খরচ	...	...	নাই	"
নিরীক্ষকদের ফিস	...	...	১৩,০০০	"
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	...	...	২৭,৭৬,৫১৭	"
আইন খরচ	...	...	৫৪,৯০৩	"
ডাক ও তার খরচ	...	...	৩,৯১,৬৪৩	"
নগদ অর্থ প্রেরণ	...	...	৭,০৩,৮৩১	"
ষ্টেশনারী ইত্যাদি	...	...	১৭,৯৬,৭৭৮	"
নিরাপত্তা ছাপান চেক, নোট ফরম ইত্যাদি	...	...	১,৩০,৮৩,৪৩০	"
সম্পত্তি অবক্ষয় ও মেরামতি	...	...	৪২,০৩,৬২৬	"
এজেন্সী খরচ	...	...	৭১,১৩,৮৮৮	"
কর্মচারী ও অবসর প্রদান তহবিল	...	...	নাই	"
বিবিধ খরচ	...	...	১,৪৬,৩৪,৮৪৩	"
নিট ব্যালেন্স	...	...	২৭,৪০,৩৪,৬৬৩	"
		মোট :	৩৪,২২,১৭,৩৬৩	টাকা

সংরক্ষিত তহবিলে হস্তান্তর	...	...	নাই	
গ্রামীন ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	...	...	১,২৫,০০,০০০	টাকা
শিল্প ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	...	...	১,২৫,০০,০০০	"
রপ্তানী ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	...	...	১,৫০,০০,০০০	"
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিলে হস্তান্তর	...	...	১,০০,০০,০০০	"
সরকারকে প্রদেয় উদ্বৃত্ত	...	...	২২,৪০,৩৪,৬৬৩	"
ব্যালেন্স	...	...	নাই	"
		মোট :	২৭,৪০,৩৪,৬৬৩	টাকা

সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব

৩০শে জুন, ১৯৭৪ এর ব্যালেন্স	...	...	৩,০০,০০,০০০	টাকা
লাভ ক্ষতির হিসাব হইতে আনিত	...	...	নাই	"
		মোট :	৩,০০,০০,০০০	টাকা

এম, এ, হক	মোহাম্মদ খালিদ খান	এ, এফ, এম, নুরুল মতিন	এ, কে, এন, আহমদ
হিসাব পরিচালক	কার্যকরী পরিচালক	ডেপুটি গভর্ণর	গভর্ণর

হিসাব নিরীক্ষকদের রিপোর্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে,

আমরা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নস্বাক্ষরকারী হিসাব নিরীক্ষকগণ ব্যাংকের ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখের প্রস্তুত ব্যালান্স শীট ও হিসাবের বিবরণী পেশ করিতেছি।

আমরা উপরোক্ত ব্যালান্স শীট ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াস্থ শাখা কার্যালয় সমূহের উপস্থাপিত হিসাব, সার্টিফিকেট ও ভাউচার এবং সিলেট ও রাজশাহী অফিস্ সমূহে সহকারী নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক পরিবেশিত ও প্রত্যায়িত রিটার্ন সমেত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছি। এই গুলি উক্ত ব্যালেন্স শীটে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এক্ষনে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যেই স্থানে ও যখনই কোন ব্যাখ্যা ও তথ্য তলব করিয়াছি তখনই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাপ্ত ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। আমাদের মতে, ব্যালান্স শীট আইন সম্মত ও সত্য। ব্যাংকের কার্য্যাবলীর সত্যিকার অবস্থা জ্ঞাপন করার নিমিত্ত সমগ্র প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ব্যালান্স শীটে যথারীতি প্রদান করা হইয়াছে। আমরা যে সমস্ত তথ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ব্যাংকের হিসাব বহি সমূহে যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, আমাদের রিপোর্ট তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত।

ঢাকা	রহমান, রহমান হক এ্যাণ্ড কোম্পানী	এস, এফ, আহমেদ এ্যাণ্ড কোম্পানী
১৯শে আগষ্ট, ১৯৭৫	চার্টার্ড একাউন্টেন্টস	চার্টার্ড একাউন্টেন্টস

তপশিলী ব্যাংক সমূহের তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকার হিসাবে)

বিবরণ সমূহ	নিম্নলিখিত তারিখে ২৮-৬-৭৪	টাকার পরিমাণ ২৭-৬-৭৫
ব্যাংক আমানত (আন্তঃ ব্যাংক হিসাববাদে)	৮৮৫'৩৯	৯৯৪'৫৮
তলবী আমানত	৪৮৫'৬৪	৫২১'৪১
মেয়াদী আমানত	৩৯৯'৭৫	৪৭৩'১৭
বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ধার	৯৪'৭৪	১১৫'৫৪
নগদ অর্থ	২১'১৪	২২'৪৫
বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ	৬৬'৬৭	৭৭'৩৪
বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাবে আমানত	৯'৪৩	১০'৭৩
বাংলাদেশে স্বল্প নোটিশ ও তলবী অর্থ	২১'০৯	২৭'১৬
বাংলাদেশে বিনিয়োগ	১৮৫'৭৭	২৪১'০১
সরকারী ঋণ পত্র	১৩৩'৪৯	১৫৩'৪৬
অন্যান্য	৫২'২৮	৮৭'৫৫
ব্যাংক ঋণ (আন্তঃ ব্যাংক হিসাব বাদে)	৮৩৬'৯৩	৮৭০'৪১
বাংলাদেশে আগাম ঋণ	৭৩৪'৯৬	৭৮১'৬৬
বাংলাদেশে ক্রীত ও বাট্টাকৃত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিল	১০১'৯৭	৮৮'৭৫
ঋণ/আমানতের অনুপাত	০'৭৮	০'৭৪

তপশিলী ব্যাংক সমূহের তালিকা

(১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে)

(ক) জাতীয় ব্যাংক

বানিজ্যিক ব্যাংক

১) সোনালী ব্যাংক

২) রূপালী ব্যাংক

৩) অগ্রনী ব্যাংক

৪) জনতা ব্যাংক

৫) পূবালী ব্যাংক

৬) উত্তরা ব্যাংক

বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যাংক

১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

(খ) বিদেশী ব্যাংক

১) গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংক

২) চার্টার্ড ব্যাংক

৩) অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস ইন্টারনাশন্যাল ব্যাংকিং কর্পোরেশন

৪) ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া